KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সন্তোষ দত্ত অ্যাভেনিউ, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : বীরেন ওয়াসান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫২/৯ ৫২/১০ ৫২/১১	Year of Publication : পৌষ ১৩৯৮ ॥ Jan 1992 মাঘ ১৩৯৮ ॥ Feb 1992 ফাল্গুন ১৩৯৮ ॥ March 1992
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুল করিম	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৯ জানুয়ারি, ১৯৯২

ব্যবসায়ী, সমাজবিরোধী এবং আমলা স্বার্থের কাছে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলগুলি যখন অসহায়, দেশের তৃণমূল স্তর থেকে স্বতন্ত্র লোকশক্তির অভ্যুত্থানের গান্ধীবাদী চ্যালেঞ্জের ভাবনা এবং কর্মকাণ্ড বিশদ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

লালনগীতির মর্মবাণী কি প্রমাণ করে না যে তিনি ছিলেন "পরম্পরিত লোকায়ত মতের গভীর নির্জন পথে" একাকী পদাতিক, যাঁকে ফেলা যায় না কোনো গোত্রেই?—লালন নিয়ে ধারাবাহিক রচনায় এবার এই জিজ্ঞাসার তথ্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ।

ড· কেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর ওকাম্পোকেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার গৌরী আইয়ুবকৃত মূল্যায়নের যে দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন, তারই জবাব দিয়েছেন গৌরী আইয়ুব।

নেতাজীবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থের পীড়াদায়ক অপূর্ণতা নিয়ে লিখেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বরাক উপত্যকায় বাঙলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা নিয়ে লিখেছেন ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

বাঙলা ধাঁধা এবং বাঙলার পূজাপার্বণের উৎসকথা নিয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষণার পর্যালোচনা।

দান্তে সম্পর্কে এঙ্গেলসকৃত মূল্যায়ন কতখানি বস্তুনিষ্ঠ, তাই নিয়ে সংশয়ের জবাবে প্রভূত তথ্যাশ্রয়ী গভীর বিশ্লেষণসমৃদ্ধ অভিমত।

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৯
জানুয়ারি ১৯৯২
পৌষ ১৩৯৮

গান্ধীর চ্যালেনজ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৯
ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির সুধীর চক্রবর্তী ৭১৩
রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে
গৌরী আইয়ুব ৭৩৪

চলচ্চিত্র সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৭০৮
দর্শন পরিমল চক্রবর্তী ৭১০
আত্মপ্রকৃতি অরুণ মুখোপাধ্যায় ৭১১
ঋণ সীমাহীন স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় ৭১২

ফালানি নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ৭২৬

গ্রন্থসমালোচনা ৭৪৪
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়,
আজহারউদ্দীন খান্, কামাল হোসেন

মতামত ৭৬০
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, গার্গী দেবনাথ, সুদীপ জোয়ারদার

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ

- বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১৫ টাকা
- বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন — ১৫ টাকা
- বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — ৮ টাকা
- কলকাতা তিন শতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর — ১২ টাকা
- ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার — ৮ টাকা

জীবনীগ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য — ৫ টাকা
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত — ২ টাকা
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত — ৮ টাকা
- সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত — ৩ টাকা
- সুকুমার : লীলা মজুমদার — ১৪ টাকা
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত — ১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

- সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত — ৩০ টাকা
- প্রেমচন্দ গল্পসংগ্রহ — ৪৫ টাকা
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসংগ্রহ — ৫০ টাকা

মুখপত্র

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা

প্রা প্তি স্থা ন

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
- ইউনিভারসিটি ইন্সটিটুট হল কাউনটার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০ ০১০

আই সি এ ৪১০৭/৯১

গান্ধীর চ্যালেনজ

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯০ খ্রী ২ থেকে ১১ই নভেম্বর এবং পরবর্তী বছরের ৩০শে জানুয়ারি থেকে ১২ই ফেবরুয়ারি আজকের ভারতের সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর বাণী নিয়ে দেশের এক লক্ষ গ্রামে পৌছাবার যে অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তার নাম গান্ধীর চ্যালেনজ। এই অভিযানের আয়োজক সর্বভারতীয় স্তরের চারটি গান্ধীপন্থায় গঠনকর্মের প্রতিষ্ঠান—সর্ব-সেবা সঙ্ঘ, গান্ধী স্মারক নিধি, গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান এবং কস্তুরবা ট্রাস্ট।

চারটি গান্ধীপন্থী প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

গোড়াতেই এই চারটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং দৃষ্টিকোণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে জেনে নিলে গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি বোঝা সহজ হবে। সর্বসেবা সঙ্ঘের সৃষ্টি ১৯৪৯ খ্রী গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত চরখা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, নঈ তালিম সঙ্ঘ প্রমুখ সর্বভারতীয় গঠনকর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ের দ্বারা। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠান খ্যাতিলাভ করে ১৯৫১ সালের পর গঠনকর্মের ক্ষেত্রে গান্ধীর উত্তরাধিকারী আচার্য বিনোবা ভাবের দ্বারা প্রবর্তিত ভূদান-গ্রামদান আন্দোলনের বাহন হিসাবে। গান্ধী স্মারক নিধির স্থাপনা ১৯৪৯ সালে গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তদানীন্তন জাতীয় নেতাদের আবেদনে দেশবাসী যে চাঁদা দেন তার দ্বারা গঠনকর্ম চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান গান্ধীনিধি দ্বারা বিশেষত অহিংসা এবং শান্তির পথে বিশ্বশান্তি এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত। কস্তুরবা ট্রাস্টের সৃষ্টি ১৯৪৫ সালে বিশেষত নারী ও শিশুদের মধ্যে গঠনকর্ম করার উদ্দেশ্যে কস্তুরবা গান্ধীর স্মৃতিতে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা।

অন্ত্যোদয়ের ধারণা

গান্ধীজীর গঠনকর্ম নিছক জনসাধারণের সেবামূলক কল্যাণকর্ম নয়। এর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক দিগন্ত বিদ্যমান, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় সর্বোদয় সমাজ। সর্বোদয়ের অর্থ সবার উদয়, কারণ তাতেই ব্যক্তির

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর চুয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে এই বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

মঙ্গল নিহিত। আর সর্বোদয়ের সূত্রপাত হল অন্ত্যোদয় থেকে। অর্থাৎ সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের উত্থান-প্রয়াস দিয়েই সর্বোদয়ের সূচনা। এই সমাজবিপ্লবের রূপায়ণ কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে করা সম্ভব নয়, যদিও অনুকূল সরকারের সহযোগী ভূমিকা মূল্যবান। যে-কোনো রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা পাবার জন্য সমাজের কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে আপোস করতে হয়। তাঁদের পরিচালিত সরকারও তাই একটা সীমার পর আর কায়েমি স্বার্থের দুর্গে আঘাত করতে পারে না। তাই দণ্ড (শাসনক্ষমতা)-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র লোক (জন)-শক্তি হল সর্বোদয়ের চালক-শক্তি, এবং এই লোক-শক্তিকে হিংসাশক্তির (পীড়নকারী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং তার দমননীতির সহায়ক পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর) বিরোধী হতে হবে। জনসাধারণের নিরব্যূঢ় স্বাধীনতা এর কমে অর্জিত হবে না।

কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতা

সর্বোদয় সমাজের এই ধারণা গান্ধীজীর মনে ১৯০৮ খ্রী "হিন্দ স্বরাজ" রচনার সময় থেকেই ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া এই নূতন সমাজ গড়ার কাজ করা সম্ভব নয় বলে গান্ধীজী ১৯১৫ খ্রী ভারতে ফিরে রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করার সময়ে পূর্বপরিচিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়াতলে সমবেত হন। ১৯২১-১৯৪৭ খ্রী ওই প্রতিষ্ঠান মূলত গান্ধীর কংগ্রেস রূপে আখ্যাত হলেও প্রতিষ্ঠানটি কোনো দিনই তার নেতার সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে নি। কংগ্রেস ছিল দেশের অভিজাত স্বাধীনতাকামীদের মঞ্চ, জাতীয় অহমিকা আহত হয়েছে এই বোধের জন্য যাঁরা ওই প্রতিষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থিক ব্যবস্থার জাতীয়তাবাদী রূপ দেওয়া ছাড়া কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁদের কাম্য ছিল না। কংগ্রেসের এই সীমাবদ্ধতার কথা গান্ধীও বুঝতেন। তাই বিশেষ সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে কার্যকর করার জন্য ১৯২৩ সাল থেকেই একে-একে চরখা সঙ্ঘ, গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ, তালিমি সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গান্ধীজী গঠনকর্মীদের এক পৃথক বাহিনী তৈরি করতে থাকেন। সঙ্গে-সঙ্গে কংগ্রেসের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসমাজকেও নিজ মতে আনার চেষ্টা জারি থাকে। তবে গতানুগতিকতাপন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গে মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হলে গান্ধী যে সর্বদা সে প্রতিষ্ঠানকে স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছেন, তা নয়। ইংরেজের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে গান্ধীকে কংগ্রেস নেতারা অপরিহার্য মনে করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা গান্ধীর সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক আদর্শকে অস্বীকার করেছেন। ১৯৩৪ খ্রী ১৭ই সেপটেমবর গান্ধীর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবার বিবৃতি থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিতে ইংরেজকে সশস্ত্র সহায়তা দেবার অঙ্গীকার এবং গান্ধীকে গোপন করে ভারতবিভাজনে সম্মতি ইত্যাদি বহু উদাহরণ এর সপক্ষে আছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পুনর্গঠনের নীতিতেও গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই-জাতীয় মৌলিক মতভেদ ছিল। ১৯৪৫ খ্রী রাজনৈতিক দিগন্তে যখন স্বাধীনতার সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর, গান্ধী তখন তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী এবং দেশের ভাবী প্রধান-মন্ত্রী জওহরলালের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সামাজিক এবং আর্থিক কাঠামো সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ৫ই অকটোবর ও ১৩ই নভেমবরের দুটি চিঠিতে। জওহরলাল তাঁর ৯ই অকটোবরের চিঠিতে একটি ভাসা-ভাসা উত্তর দিলেও এবং পরে সময় করে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব বলে আশ্বাস দিলেও ১২ই নভেমবর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাঁর বাপুর জীবিত কালের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার সময় পান নি। জওহরলালের তো তবু এসব ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে মৌলিক মতপার্থক্য স্বীকারের সৎসাহস ছিল। কিন্তু প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাজী প্রমুখ যেসব কংগ্রেস নেতা গান্ধীবাদী নামে পরিচিত ছিলেন এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পুনর্গঠনে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন, প্রকাশ্যে গান্ধীর প্রতি আনুগত্য ব্যক্ত করলেও তাঁরা কেউ সরকারি বা শাসকদলের নীতিতে গান্ধী-আদর্শের প্রতিফলনের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস করেন নি।

শেষ উইল ও ইচ্ছাপত্র

স্বাধীনতার পর যে কয় মাস গান্ধী বেঁচেছিলেন তা তাঁর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং তার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন নেতাদের সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটার কাল। এই মোহ-মুক্তি গান্ধীবাদী নামে আত্মপরিচয়দানকারী কংগ্রেসি নেতাদের ব্যক্তিগত স্তর অতিক্রম করে আরও গভীরে মূল নীতির স্তরে ছিল। জীবনের শেষ কয়টি দিন তাই গান্ধীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও বজায় রাখার সাধন হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্মরত এক লোকসেবক সঙ্ঘের স্থাপন। মৃত্যুর সামান্য কিছু সময় পূর্বে যে দস্তাবেজটিকে ঘসামাজা করে মহাত্মা অন্তিম রূপ দেন তা তাঁর শেষ উইল ও ইচ্ছাপত্র (Last will and Testament) নামে খ্যাত। এর নীট বক্তব্য হল—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার হাতিয়ার হিসাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন 'সামরিক শক্তির উপর অসামরিক শক্তির প্রভুত্ব স্থাপনার' জন্য কংগ্রেসকে লোকসেবক সঙ্ঘে রূপান্তরিত করতে হবে। লোকসেবকেরা এক গ্রামে একজন হিসাবে দেশের পাঁচ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়বেন। নির্ধারিত গ্রামে জনসাধারণের একজন হয়ে তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে বসবাস করার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা নিত্য গঠনকর্মে রত হবেন এবং ভোটার তালিকায় যাতে যোগ্য সবার নাম ওঠে সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন। নিত্য গঠনকর্মের দ্বারা জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা হয়ে তাঁরা এমন ভাবে জনশক্তির বিকাশ করবেন যে তাঁদের স্বাধিকারের উপর কোনো দিক থেকে আক্রমণ এলেই যেন তাঁরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন। তাঁর আদর্শের স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পূর্বে ১৯২৫ খ্রী ২৯শে জানুয়ারি মহাত্মা বলেছিলেন: 'শুধু কয়েক-জনের হাতে ক্ষমতা এলে নয়, যথার্থ স্বরাজ আসবে কেবল তখন যখন ক্ষমতার অপব্যবহার হলে কর্তৃত্বের প্রতিরোধ করার যোগ্যতা সকলের দ্বারা অর্জিত হবে। ঘুরিয়ে বলতে গেলে স্বরাজ অর্জন করতে হবে কর্তৃত্বের নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে।' (ইয়ং ইনডিয়া)

স্বতন্ত্র লোকশক্তির পরিকল্পনা

স্বতন্ত্র লোকশক্তির পরিকল্পনা গণতন্ত্রের ইতিহাসে সর্বোদয়ের এক মৌলিক অবদান। প্রচলিত গণতন্ত্র চলে সরকারি ও বিরোধী দল—এই দুটি চাকার উপর ভর করে। বিরোধী দলের অন্তিম লক্ষ্য হল সময়ে সরকারি দলে পরিণত হয়ে শাসনক্ষমতা অর্জন এবং তার যাবতীয় প্রয়াস ওই লক্ষ্যপ্রাপ্তির জন্য। সর্বোদয় সমাজে এক তৃতীয় শক্তি বা স্বতন্ত্র লোকশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের রূপায়ণের জন্য। লোকসেবক ও লোকশিক্ষকদের এই তৃতীয় শক্তি কখনই ক্ষমতায় যাবার কথা চিন্তা করবে না। নিরপেক্ষ থেকে এইসব লোকসেবকরা গুণাগুণের ভিত্তিতে দেশবাসীদের সামনে উপস্থিত প্রতিটি প্রশ্ন সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করবেন। ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাঁদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি হবে স্বচ্ছ। বিরোধী পক্ষের মতো যেন তেন প্রকারেণ সরকারি দলকে অপ্রিয় করে তার স্থলাভিষিক্ত হবার ইচ্ছা না

থাকায় এক দিকে সমাজে রাজনৈতিক বিরোধ-সংঘাত হ্রাস পাবে এবং অন্যদিকে জনসাধারণের কাছে লোক-সেবকদের বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পাবে। কোনো সময়ে কোনো সরকারি দলের ক্রিয়াকলাপ জনস্বার্থের একান্ত বিরোধী হলে এই লোকসেবকরা জনসাধারণ-কে বিদ্রোহী হতে আহ্বান জানাবেন এবং সে বিদ্রোহের নেতৃত্বও দেবেন। প্রচলিত গণতন্ত্রের বিরোধী দলের পক্ষে এজাতীয় গণনেতৃত্ব দেবার সম্ভাবনা নেই। কারণ ক্ষমতালাভের ইচ্ছা দ্বারা তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত—জনসাধারণ একথা জানে বলে তাঁদের আহ্বানে জনসাধারণ ক্ষমতাপ্রাপ্তির অভিসন্ধি খুঁজে পাবে। গঠনকর্মী লোকসেবকদের এই তৃতীয় শক্তির সঙ্গে পুরাণের শিবশক্তিরও তুলনা করা যেতে পারে। জনগণের সঙ্গী ও জনগণের মানুষ শিব কখনও ইন্দ্রত্ব (স্বর্গের রাজত্ব) পাবার অভিলাষী নন। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের একজন হয়ে তিনি থাকেন। কিন্তু সেই "গণ"-এর উপর অন্যায়-অবিচার হলে প্রতিকারার্থ তাদের নিয়ে তিনি তাণ্ডব শুরু করেন। এই হল গান্ধীপন্থার গঠনকর্ম ও গঠনকর্মীর আদর্শ ভূমিকা।

আঠারো-দফা গঠনকর্মের কথা

গান্ধীজী তাঁর জীবিতকালে আঠারো-দফা গঠন-কর্মের কথা বলেছিলেন। এগুলি হল: সাম্প্রদায়িক ঐক্য, খাদি, অন্যান্য গ্রামোদ্যোগ, রাষ্ট্রভাষাপ্রচার, মাতৃভাষার প্রচার, নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা, কুষ্ঠরোগের সেবা, শ্রমিকদের সেবা, কৃষকদের সেবা, ছাত্রকল্যাণ, নারীকল্যাণ, মদ্য ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য নিষেধ, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বয়স্ক-শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বিধি-বিধান সম্বন্ধে শিক্ষা, আর্থিক সমতা স্থাপনের প্রয়াস এবং আদিবাসী ও গিরিজনদের সেবা। এই তালিকা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে গান্ধীজী একথাও বলেছিলেন যে, এটা কোনো সম্পূর্ণ তালিকা নয়। জনশক্তিকে জাগানোর এবং সংগঠিত করার যে-কোনো কার্যক্রম গঠনকর্মের মর্যাদা পেতে পারে। এই পরিভাষা অনুযায়ী, পরবর্তী কালে বিনোবাজী-প্রবর্তিত ভূদান, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, কূপদান, সর্বোদয় পাত্র ইত্যাদি দানের নূতন ব্যাখ্যা (সমবিভাগ) গঠনকর্মের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে।

সর্বসেবা সংঘ

যাই হোক, স্বাধীনতা-উত্তর কালে কংগ্রেসের গতানুগতিক পন্থা গ্রহণ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ঊর্ধ্বে উঠে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নব-পদক্ষেপের অনীহা দেখে গান্ধীজী তাঁর আদর্শ অনুযায়ী নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টির কাজে ব্রতী হবার জন্য গঠন-কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তদনুসারে লোকসেবক সঙ্ঘ স্থাপনা ও তার মাধ্যমে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪৮ খ্রী ফেব্রুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে প্রমুখ গঠনকর্মীদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের কাজ থেকে কিছুদিন ছুটি নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতকে সর্বোদয়ের পথে নিয়ে যাবার এই কাজে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং সেবা-গ্রামের ওই সভায় উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি—সাম্প্র-দায়িক ঐক্য স্থাপনার কাজেই তাঁকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল।

তবে আর কয়েক মাস পর সেবাগ্রামে গঠনকর্মী ও গান্ধীজনদের সেই সভা হয়েছিল। আর গান্ধীজীর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে রচিত হয়েছিল সর্বোদয় সমাজ। পরবর্তী বৎসরে সর্বোদয় সমাজের প্রথম সম্মেলনে এই আদর্শের বাহন বা সংগঠন রূপে স্থাপিত হয়েছিল সর্বসেবা সংঘ। গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত গঠনকর্মের তাবৎ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার ওই সংগঠন—সর্বসেবা সংঘ। সেই অবধি গান্ধীপন্থার গঠনকর্মের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এই সংঘ।

দুই

১৯৯০ সালে দেশের পরিস্থিতি

১৯৯০ খ্রী যখন গান্ধীর চ্যালেঞ্জ অভিযানের পরিকল্পনা করা হল তখন দেশের পরিস্থিতি কেমন, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

কংগ্রেস ও সেই দলের শাসন সম্বন্ধে ভারতবাসীর মোহমুক্তি ঘটেছে নূতন করে। ১৯৬৭ খ্রী থেকে প্রথমে রাজ্যগুলিতে এবং তার দশ বছর পর কেন্দ্রেও কংগ্রেসের শাসনে সাময়িক ছেদ পড়েছিল। তবে কিছু-না-কিছু সময়ের জন্য ভারতের উল্লেখযোগ্য সবকয়টি রাজনৈতিক দলই রাজ্যগুলিতে শাসন-ক্ষমতা পেয়েছিল। কিন্তু কোনো দলই জনসাধারণের মৌলিক সমস্যা—দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ এবং এমনকী পানীয় জলের অভাব দূর করার ব্যাপারে কোনো মৌলিক কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে এখনও দেশের এক-তৃতীয়াংশের উপর নাগরিক দারিদ্র্যসীমারেখার নীচে, প্রতি পরিকল্পনায় অযুত-নিযুত-কোটি টাকা ব্যয় করলেও কর্মসংস্থানকেন্দ্রগুলিতে (মোট কর্ম-হীনের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নাম লেখায়) নাম তালিকা-ভুক্তকরা বেকারের সংখ্যা প্রতিটি পরিকল্পনাকালের শেষে কমার বদলে বেড়ে চলেছে, খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত হবার যে পরিসংখ্যান দেখানো হয় তার কারণ জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার ক্রয়শক্তি নেই, বস্ত্রের মাথাপিছু ব্যবহারের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ১৫ বর্গমিটার থেকে দীর্ঘকাল বাড়ছে না—বরং একটু কমেছে, নিরক্ষরদের তালিকায় ভারতের স্থান পৃথিবীতে উপরের দিকে, অচিকিৎসা-কুচিকিৎসায় মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যাতেও আমরা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরের অর্ধেক নর-নারী-শিশু হয় ফুটপাথ নচেৎ পশুবাসেরও অযোগ্য বস্তির বাসিন্দা। এদেশের অধিকাংশ গ্রামে দূরদর্শনের মাধ্যমে নেতাদের প্রতিকৃতি এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানি ও বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানদের পণ্যের খবর পৌঁছে গেলেও এক লক্ষেরও উপর গ্রামে এখনও শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে নয়, গুজরাতের তাপ্তি-নর্মদা এবং তামিলনাড়ুর কাবেরী-কৃষ্ণা-সিঞ্চিত এলাকাতেও লক্ষ-লক্ষ নর-নারীকে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন পানীয় জল পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাবৎ রাজ-নৈতিক দলের অহোরাত্র জনসাধারণের কল্যাণ করার প্রতিশ্রুতি এবং কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ও কয়েক শত মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়ে সাধারণ নির্বাচনে (১৯৭৭ খ্রী থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই দু বার) যে রথযাত্রা হয় এবং তার পরিণামে কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে দলেরই হাতে ক্ষমতা আসে না কেন, জনসাধারণের নীট অবস্থার বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র লোকশক্তি

গঠনকর্মের মূল লক্ষ্য হল দলনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র লোক-শক্তি গড়ে তোলা, নিজের বিধিলিপি যে লোকশক্তি নিজেই রচনা করবে। তা ছাড়া, প্রায়োগিক দিক থেকেও বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে প্রচলিত কোনো দলই প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কোনো মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারে নি, এবং

তাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি দেখে এমন কোনো ভরসা হয় না যে আরও দশ-বিশ-ত্রিশবছর তারা নিজেদের নির্ধারিত পথে চলে এ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। এ অবস্থায় গঠনকর্মীদের কর্তব্য কী? রাজনৈতিক দলগুলির কোনো একটিকে সমর্থন করা, অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নূতন কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা—যে দল জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে প্রশাসনযন্ত্র করায়ত্ত করবে এবং পরে তার মাধ্যমে জনকল্যাণ করবে?

নিঃসন্দেহে এ প্রশ্নের উত্তর হল একটি জোরালো "না"। কারণ প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলসমূহের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর। শাসকদল বদলালে উনিশ-বিশের তফাত হবে, কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না।

আমলা-স্বার্থের সামনে অসহায়

কথাটাকে আর-একটু খুলে বলা দরকার। প্রশাসনযন্ত্র চলে তার স্থায়ী আমলা-পুলিশদের বলে। উপরে মন্ত্রীদের মধ্যে রদবদল হলেও তার চরিত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না। এমনকী প্রচণ্ডতম জনদরদি রূপে দাবিদার কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেও দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকেও আমলাদের কাজে ফাঁকি, জনসাধারণকে শোষণ করা এবং দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয় নি। সরকারি আমলারা আজ এক সুবিধাভোগী সম্প্রদায়, ক্রমবর্ধমান দুর্মূল্যের মধ্যে যারা নিজেদের বেতন-ভাতা এবং প্রকারান্তরে কর্মশৈথিল্যকে আইনসঙ্গত করে নিয়েছে। কোনো-কোনো রাজ্যে তারা শাসকদলের রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত হয়ে এবং সংখ্যাশক্তির চাপ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্থাৎ মন্ত্রী ও বিধায়কদের আমলা-স্বার্থের সামনে অসহায় করে তুলেছে। জনসাধারণের হিতার্থে প্রদত্ত করের সিংহভাগগ্রাসকারী (১৯৮৭ খ্রী ডিসেমবরে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রকাশ্য খেদোক্তি—দরিদ্রদের বিকাশের জন্য সরকার এক টাকা ব্যয় করলে তার ৮৫ পয়সা যায় সরকারি আমলা পুষতে—স্মরণীয়) আমলারা প্রশাসনযন্ত্রের জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের অর্থে তাদের শোষণ করার সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মধ্যে আছে। এই কাঠামোর উপর যে রাজনৈতিক দলই আসীন হোক না কেন, জনকল্যাণের দিক থেকে কোনো ইতর-বিশেষ হবে না এবং স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছরে হয়ও নি।

ব্যবসায়ী ও সমাজবিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ

আর রাজনৈতিক দলগুলির ভিতরের অবস্থা কী? আমলাদের সংগঠিত শক্তির সামনে তাদের অসহায়তার কথা পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক প্রশ্ন হল রাজনৈতিক দলগুলির ব্যবসায়ী ও সমাজবিরোধীদের কাছে আত্মসমর্পণ। গুরুত্বসহকারে নির্বাচনযুদ্ধে যোগ দিতে হলে যে টাকা খরচ করতে হয় তার ক্ষুদ্রতম একাংশও রাস্তার মোড়ে বা সভা-সমাবেশে চাঁদার কৌটো সবার সামনে তুলে ধরে বা পার্টির সদস্যদের চাঁদায় কিংবা সমর্থকদের বদান্যতায় জোগাড় করা যায় না। ডান-বামনির্বিশেষে তাবৎ রাজনৈতিক দলের কেবল নির্বাচনী তহবিলই নয়, পার্টির বাড়ি-গাড়ি-দৈনিক রাজসিক খরচ চলে ব্যবসায়ীদের টাকায়। রাশিয়ায় অগস্ট ১৯৯১-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কুবেরের ধনসম্পত্তির যে বিবরণ পাওয়া গেছে তা কেবল ওদেশের বৈশিষ্ট্য নয়। এদেশেও যে-কোনো রাজনৈতিক দল—রাজ্য বা কেন্দ্র যেখানেই উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ক্ষমতায় এসেছে—এইভাবে ব্যবসায়ী সমাজের অর্থে দৃষ্টিগোচরভাবে বিত্তশালী হয়েছে। যে-কোনো সচেতন ব্যক্তি চোখ খুলে পার্টিগুলির দপ্তর ও কার্যপদ্ধতি দেখলেই

এ সত্য উপলব্ধি করবেন। ব্যবসায়ীরা (এর মধ্যে বিদেশী কোম্পানিও পড়ে) কি নিছক পরহিতব্রতে চালিত হয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে এভাবে কোটি-কোটি সাদা এবং কালো টাকা দেয়? এর উত্তরও এক জোরালো "না"। ব্যবসায়ীরা এক টাকা দেয় রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে (প্রশাসকদের তারা যে অতিরিক্ত দক্ষিণা দেয় তা পৃথক) দশ টাকা আয় করতে। আর এই ফালতু টাকা দেওয়া-নেওয়ার সম্পূর্ণ বোঝাটা পড়ে দেশের উপভোক্তা এবং সর্বসাধারণের উপর। কারণ ধাপের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে সাধারণ মানুষ যাদের এই শোষণ-শাসনব্যবস্থার বোঝা বইতে হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলগুলির ভোট সংগ্রহের জন্য অসামাজিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ আর কোনো গোপন তথ্য নয়। পুলিশের কাছে অনুরোধ করে বা চাপ দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এইসব অসামাজিক ব্যক্তিদের রক্ষা করার প্রক্রিয়া থেকে এর সূচনা। সমারোহে দুর্গা-কালীপূজা অথবা পাড়ার "সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের" আয়োজন করার সুযোগ দেবার মাধ্যমে তাদের নিত্যকার আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা দেবার মধ্যে এর বিকাশ। আর এর পরিণতি হল তাদের বিধানসভা-লোকসভার নির্বাচনে প্রার্থী করা এবং শেষ অবধি মন্ত্রী করা। কেবল বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো সামন্তবাদী রাজনীতির প্রদেশে অসামাজিক ব্যক্তিরা মন্ত্রিপদ অলঙ্কৃত করে নি, রাজনৈতিক সচেতনতার দাবিদার পশ্চিমবঙ্গেও কি কংগ্রেস কি বামমোর্চা—সবার মন্ত্রিসভাতেই এজাতীয় ব্যক্তিদের সদস্য হতে দেখা গেছে। অসামাজিক ব্যক্তিদের প্রথমে রাজনৈতিক নেতারা কাজে লাগাতেন। এখন তারা আর পরোক্ষ ভাবে নয়, সরাসরি ভাবে রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে যোগদান করছে।

গঠনকর্মীরা তবে কি নূতন কোনো রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করবে যাতে প্রচলিত দলগুলির দোষ থাকবে না এবং যার সহায়তায় ক্ষমতায় গিয়ে তাদের আদর্শ সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক লক্ষ্যের রূপায়ন করা যাবে? এও এক অবাস্তব কল্পনা। কারণ নূতন পুরাতন যে-কোনো রাজনৈতিক দলকেই ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রচলিত পন্থা নিলে একই চারিত্রধর্ম গড়ে তুলতে হবে। সুমহান বিপ্লবীতত্ত্বের উদ্‌ঘোষকারী একাধিক রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাপ্রাপ্তির এই পথ গ্রহণ করে নিজেদের চরিত্র খোয়াতে হয়েছে—এ উদাহরণ চোখের সামনেই রয়েছে। বর্তমান অবস্থা বদলাবার আর-একটি পথ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং এ হল সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থা। অহিংসায় বিশ্বাসী গঠনকর্মীরা এ পথের কথা চিন্তাই করতে পারে না। তা ছাড়া, আপাদমস্তক হিংসাশক্তিতে সজ্জিত কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবীর বা জনগণের সশস্ত্র উত্থান যত প্রবলই হোক না কেন, কখনও জয়ী হতে পারে না। আধুনিক রাষ্ট্রের অধীন সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রের তুলনায় জনসাধারণ বা বিপ্লবীরা কতটুকু অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে? তাই শেষ অবধি জনসাধারণের সশস্ত্র বিদ্রোহ শ্রেণীসংগ্রাম বা অপর যে নামেই পরিচালিত হোক না কেন ব্যক্তিসন্ত্রাসে পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সদিচ্ছাপ্রণোদিত নকশালি আন্দোলনের এই পরিণতি ঘটেছে। পানজাব, আসাম বা কাশ্মীরে যেসব সশস্ত্র অভ্যুত্থান চলছে সেগুলিও তাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতানির্বিশেষে অনুরূপ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

গঠনকর্মীদের পথ তাই প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের। গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযান তার প্রথম ধাপ।

তিন

প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের পথ

গণতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণ সার্বভৌম। তাঁদের

হাতেই সমাজ-সরকার-অর্থব্যবস্থা পরিবর্তনের শক্তি। প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত হলে এর সঙ্গে অসহযোগ করবেন এবং এর বিকল্প খুঁজে বার করে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হবেন। প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটি বুঝতে এবং তার বিকল্প খুঁজতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যা দরকার তা হল বিচার-বিবেচনা। গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানে এই বিচার-মন্থনের কাজ আরম্ভ করা হয় চারটি সূত্র ধরে। সূত্রগুলি দেশের বর্তমান আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

এর প্রথম সূত্র হল সবার জন্য কর্মসংস্থান। খেটে খেতে ইচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থান করতে না পারা যে-কোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের অর্থব্যবস্থা এবং পরিকল্পনার দেউলিয়া অবস্থার দ্যোতক। এত লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সাতটি পরিকল্পনার রূপায়ন সত্ত্বেও প্রতি পরিকল্পনার শেষে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া ভারতের পরিকল্পনা-পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির পরিচায়ক। জওহরলাল নেহরু-প্রবর্তিত পরিকল্পনার এই মহলানবীশ মডেলের মূলকথা ছিল শিল্পায়নের দ্বারা সমৃদ্ধি আনয়ন এবং উপরের সেই সমৃদ্ধি চুঁইয়ে (percolate) নীচের মানুষদের অবস্থারও উন্নতি করবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বিদেশ ও স্বদেশ থেকে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে এবং "কোর সেক্টর" বা মূল ক্ষেত্রে সরকার-পরিচালিত কল-কারখানা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নেহরু মডেলের উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান তো কমেই নি, বরং বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বহু লক্ষ কোটি টাকার মূলধন গত দশ বছরে বিনিয়োগ করলেও শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমেছে। এছাড়া দেশী-বিদেশী ঋণ ও তার সুদের চাপে অর্থব্যবস্থার দেউলিয়া অবস্থা—যে কারণে ভারতীয় মুদ্রার সাম্প্রতিক দ্বিতীয়বার অবমূল্যায়ন। এ ছাড়া, নিয়োজিত মূলধনের বড়ো একটা অংশ (পাবলিক সেকটরের প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা) ঋণের সুদ দেবার মতো মুনাফা অর্জন করতে না পারায় তার ঘাটতি সাধারণ রাজস্ব থেকে মেটাতে গিয়ে (এবং অন্যান্য অনুৎপাদক সরকারি খরচের জন্য) মুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধি ঘটে সাধারণ মানুষের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে। দেশের জল, মাটি ও বায়ুর প্রদূষণ, গ্রাম ও শহরের আর্থিক বৈষম্য এবং তজ্জনিত সামাজিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি নেহরু মডেলের উন্নয়নের অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

গান্ধীর উন্নয়ন মডেল

এর একমাত্র বিকল্প গান্ধীর উন্নয়ন মডেল। এর মূল কথা হল দেশের সবাইকে কাজ দেওয়া এবং স্থানীয় কাঁচা মালকে যথাসম্ভব স্থানীয় বেকার শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের উপভোগ্য উপকরণে পরিণত করা। খাদি-গ্রামীণ-শিল্পমূলক এই শিল্পায়নব্যবস্থায় বিদ্যুৎ বা উচ্চতম প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণে বাধা নেই যদি তা মানুষের কর্মের সুযোগ কেড়ে না নেয় এবং ওই ব্যবস্থা, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নয়, সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে আর আয়ত্তে থাকে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের তুলনায় এতে মাথাপিছু উৎপাদন কমবে ঠিকই; কিন্তু সব বেকার হাত উৎপাদনে লাগবে বলে (mass production নয়, production by masses) মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আর এই প্রক্রিয়ায় বৃহৎ শিল্পে বর্তমানে কর্মরত (দেশবাসীর ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র) শ্রমিক-কর্মচারীদের তুলনায় মাথাপিছু কম আয় হলেও দেশের সবাই কাজে লেগে যাবেন বলে সবার হাতে সীমিত হলেও ক্রয়শক্তি আসবে। সেই ক্রয়শক্তির সাহায্যে তাঁরা নিজেদের ভোগ্য উপকরণের চাহিদা মেটাবেন বলে ওইসব পণ্যের বাজার আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে অর্থব্যবস্থাকে গতিশীল করে তুলবে। গান্ধীর মডেলে দেশী মূলধনীদের পিছু-পিছু বিদেশী বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানি এবং তাদের আন্তর্জাতিক সংগঠন

বিশ্ব ব্যাঙ্ক-আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পক্ষে ভারতের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে রাজনীতিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। স্বদেশী এবং স্বাবলম্বন হবে বিকল্প অর্থব্যবস্থা ও পরিকল্পনা নীতির বনিয়াদ।

স্বদেশী ও স্বাবলম্বনভিত্তিক অর্থনীতি এবং উন্নয়ন মডেল গ্রহণের দুটি অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত। এর প্রথমটি হল আমাদের কাছের প্রতিবেশী—শিল্পী-কারিগর যেসব ভোগ্য উপকরণ উৎপাদন করেন, তা তুলনামূলকভাবে কিছুটা দামি অথবা নয়নাভিরাম না হলেও দূরের পুঁজিপতিদের কল-কারখানায় তৈরি অপেক্ষাকৃত সস্তা বা নয়নমনোহর পণ্যের বদলে ব্যবহার করতে হবে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময়ে এই যে স্বদেশী মনোভাব—এর বলেই দেশী শিল্প-ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশী শিল্পের সঙ্গে লড়াই করে। বর্তমানে সবার কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ- এবং কুটীর-শিল্পকেও একই ভাবে স্বদেশী মানসিকতার দ্বারা সংরক্ষণ দিয়ে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা করতে হবে। উপভোগ্য উপকরণের ক্ষেত্রে খাদি- ও কুটীর-শিল্পের ভূমিকা এইখানে। স্বদেশী মানসিকতা কোনো পণ্য কেনার পূর্বে আমাদের এই কথা বিচার করতে বাধ্য করবে যে কুটীর বা গ্রামীণ শিল্পে ওইজাতীয় পণ্য উৎপন্ন হয় কি না। হলে সেই পণ্য গ্রহণ এবং বৃহৎ শিল্পের (দেশী ও বিদেশী মালিকানার) পণ্য বর্জন। সচেতনভাবে যুগপৎ এই গ্রহণ-বর্জন নীতি আচরিত না হলে কুটীর গ্রামীণ বা জনগণের শিল্প চলবে না এবং সবার কর্ম-সংস্থানও হবে না। বলা বাহুল্য, নিত্যব্যবহার্য পণ্যের জন্যে মূলধনী উৎপাদনব্যবস্থার উপর আশ্রিত থেকে "পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক" স্লোগান দেবার মধ্যে যে স্ববিরোধ রয়েছে, তার অবসানের পথও এই স্বদেশী গ্রহণের নীতির মধ্যে।

শ্রমের সংস্কৃতি

এর দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্ত হল—শিক্ষা-ব্যবস্থাকে উৎ-পাদনমূলক শ্রমভিত্তিক করা। কারণ আজকের অধিকাংশ শিক্ষিত বেকার কেবল কর্মহীনই নন, কাজে লাগাবারও অনুপযুক্ত (unemployable)। স্কুল-কলেজে দৈনিক ছয়-আট ঘণ্টা, তারপর হোম-টাস্কের জন্য বাড়িতে আরও তিন-চার ঘণ্টা কেবল বইখাতা নিয়ে জীবনের অতিমূল্যবান পনেরো-বিশ বছর দিনের পর দিন মুখ গুঁজে তাঁদের কাটাতে হয় বলে গায়ে ধুলো-মাটি লাগবে না কেবল সেইজাতীয় "চাকরি" ছাড়া তাঁরা আর তাবৎ কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েন। আর আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এরকম চাকরির মাধ্যমে সব শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের কোনো সম্ভাবনাই নেই। নতুন কর্মসংস্থান সম্ভব কৃষি এবং উপভোগ্য উপকরণ-সমূহের উৎপাদনের মাধ্যমে—কৃষক-শ্রমিকদের পেশায় বা স্বনিযুক্তির পরিকল্পনায়। সাম্যবাদী সমাজ যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তবে একদল উৎপাদক এবং অন্যদল উপভোক্তা, এক দল শ্রমজীবী আর এক দল বুদ্ধিজীবী—এজাতীয় উৎপাদনব্যবস্থা চলতে পারে না। যদি কোনো একটি শ্রেণীর একক ভাবে টিকে থাকার শক্তি থাকে, তবে তা হল উৎপাদক শ্রেণী। তাই সবাইকে উৎপাদক হতে হবে—কিন্তু বুদ্ধিমান আর শিক্ষিত শ্রমিক। নচেৎ উৎপাদনব্যবস্থা কুণ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক বিকাশ ব্যাহত হবে। সাম্যবাদী শিক্ষিত শ্রমিকদের সমাজ গড়ার উপায় গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা। এর মূল নীতি হল সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপভোগ্য উপকরণ উৎপাদনের মাধ্যমে শিক্ষা দান। সমাজ শিক্ষার মূলধনী ব্যয়ের সংস্থান করবে; কিন্তু তার আবর্তক ব্যয় রোজগার করতে হবে ধাপে-ধাপে ছাত্র আর শিক্ষকদের শ্রমের দ্বারা। ভারতের মতো সামন্তবাদী মানসিকতার দেশে শ্রমের সংস্কৃতি

প্রতিষ্ঠার জন্য এ অপরিহার্য। আর দরিদ্র এবং দারিদ্র্যের দেশে স্বল্প কালের মধ্যে সার্বত্রিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দ্বিস্তর (অভিজাত ও সাধারণের জন্য পৃথক-পৃথক) নীতি সামাজিক অসাম্যকে আরও বাড়াচ্ছে, তার প্রতিবিধানও যে এই পথে সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

পার্টির 'লোক' এবং প্রশাসনকর্মীদের অনুৎপাদক বাহিনী

গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের বিচার-মন্থনের দ্বিতীয় সূত্রটি হল—জনসাধারণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তরণ। আমাদের সংবিধান অনুসারে, জনসাধারণ সার্বভৌম হলেও সে ক্ষমতা আসলে চলে গেছে রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসকদের হাতে। নির্বাচনের সময়ে একবার ভোট দেবার সময়ে জনসাধারণ সার্বভৌম হন বটে। কিন্তু তাঁদের সার্বভৌমতা সীমিত শুধু ক বা খ নামক দলকর্তৃক মনোনীত গদির প্রত্যাশীদের মধ্যে একজনকে বাছার। তবে যেখানে জাল ভোট, বুথ দখল এবং অন্যান্য নির্বাচনী হিসার (এর প্রভাব ক্রমশ বেড়েই চলেছে) কারণে তাঁর আর স্বাধীনভাবে মত দেবার পরিস্থিতি থাকে না, সেখানে কয়েক বছর পর সার্বভৌমত্বের স্বাদ পাবার এই চিহ্নটুকুও থাকে না। এ ছাড়া, প্রচণ্ড অর্থবলে বলীয়ান প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলি নানা প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় নির্বাচনের পূর্বে যে গণহিস্টিরিয়া সৃষ্টি করে, তাতে শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পক্ষেই গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন হয়, সাধারণ ভোটারের পক্ষে তো পরিস্থিতি আরও দুরূহ হয়ে ওঠে। বিধানসভার নির্বাচনক্ষেত্রই এত বিশাল যে অধিকাংশ ভোটারের পক্ষে প্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে জানা আর গুণাগুণের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে একজনকে বাছা সম্ভব হয় না। লোকসভার ক্ষেত্রে তো এ সমস্যা আরও প্রকট। সুতরাং তাঁদের কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। দল বা পার্টির কাজ part বা অংশ নিয়ে—সর্বসাধারণের সেখানে কোনো স্থান নেই। এই পার্ট বা অংশের তাত্ত্বিক রূপ হল দলের কয়েক জনের একজিকিউটিভ কমিটি বাপলিটব্যুরো আর ফলিত রূপ হল তার নেতাবিশেষ। বিদেশের স্তালিন, ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ অথবা গর্বাচভ বা এমনকী ইয়েলৎসিন। স্বদেশের নেহরু (তাঁর অপ্রসন্নতার কারণ ট্যাণ্ডন আরও অনেক স্বাধীনতাসংগ্রামীর দশা স্মরণীয়), ইন্দিরা (আর সবার তাঁর কাছে দাস্যমুখে আত্মসমর্পণ), রাজীব (পাওয়ার-ব্রোকারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তাদেরই হাতে বন্দী), বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (হায় "ভ্যালু বেসড" রাজনীতি!) অথবা জ্যোতি বসু (গদি ও গোষ্ঠী বাঁচাবার জন্য তাবৎ আপোসরফায় প্রস্তুত) প্রমুখ হলেন দলের স্বদেশী মুখপাত্র। কিন্তু এ তো গেল দলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্বের কথা। এই কেন্দ্রীয় স্তরের নেতাদের নিজ নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় যাদের ভরসায় সেই স্থানীয় নেতা, দাদা বা পার্টির "লোকেদের" চাল-চলন, দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখলে তাবৎ পার্টির জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র ফুটে উঠবে। যদি কোনো একটিমাত্র মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে বড়ো-বড়ো রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের উৎস কী তা খতিয়ে দেখলে (মতবাদ নিয়ে এসব দলের মধ্যে যত প্রকাশ্য বিরোধই থাক না কেন, একটি বিষয়ে সবাই সহমত এবং তা হল দলের আয়ের উৎস প্রকাশ্যে ঘোষণা না করা) এদের টিকি কোথায় বাঁধা সহজেই জানা যাবে।

জনসেবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের অর্থে দেশে লক্ষ-লক্ষ প্রশাসনকর্মীদের যে বিপুল অনুৎপাদক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে তার সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্য জনকল্যাণের জন্য ব্যয়িত করদাতাদের অর্থের শতকরা ৮৫ ভাগ খরচ করতে হয়—এই খেদোক্তি ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর। ১৯৮৭ খ্রী ডিসেম্বরে সেই প্রকাশ্য হা-হুতাশ করার পর তিনি বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কেউ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেন নি, হয়তো বা অবনতিই ঘটেছে। জনসাধারণের অর্থে তাদের সেবার নামে অধিকতর সুযোগ-সুবিধাভোগী এই গোষ্ঠীটি যদি নিজেদের নির্ধারিত কাজ যোগ্যতা আর তৎপরতার সঙ্গে করতেন তাহলে ক্ষোভের কারণ কিছুটা কম হত। কিন্তু দক্ষ প্রশাসক রূপে পরিচিত বামফ্রনট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও যখন অসহায়ভাবে বলতে হয়—কাকে কাজ করতে বলব, চেয়ার-টেবিলকে ?—তখন সরকারি দপ্তরসমূহের অবস্থা কী শোচনীয় তার আভাস মেলে। এমনিতে সরকারি দপ্তরে কোনো কাজে যাবার দুর্ভাগ্য যে নাগরিকের হয়েছে তিনি সেখানকার জনস্বার্থবিরোধী পরিবেশ এবং আচরণের ভুক্তভোগী। ব্যতিক্রম প্রশাসনযন্ত্রেও আছে—কিন্তু তা ব্যতিক্রমই। সাধারণ নিয়মই হল সাধারণ মানুষের হয়রানি এবং বাঞ্ছিত কাজ পেতে হলে হয় বেআইনি অর্থ আর না হয় রাজনৈতিক কিংবা অন্যবিধ পরিচয়সূত্রের প্রভাববিস্তার। প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে প্রভাববিস্তারের জন্য টাকা আর পরিচয়সূত্রকে কাজে লাগাবার আধুনিক নাম লবিইং, বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পি. আর. ও এবং অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে যার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা রাখে।

চাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

সংবেদনশীলতাবিহীন এই প্রশাসনযন্ত্রের কারণ হল বিচ্ছিন্নতাবাদ : যার কাজ এবং যাকে করতে হবে তাদের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কবিহীনতা। অভাব, অত্যাচার বা সমস্যাক্রান্ত নরনারী সরকারি দপ্তরে লাল ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ ফাইলের একটি "কেস" মাত্র—নৈর্ব্যক্তিকতার নিষ্ঠুর উদাহরণ। প্রশাসন-ব্যবস্থাকে যাদের জন্য প্রশাসন, তাদের সঙ্গে মানবীয় সম্বন্ধে যুক্ত করতে না পারলে কেবল উপরে রাজনৈতিক কর্ণধারদের পরিবর্তন অথবা আরও কিছু ভালো-ভালো উদ্দেশ্যের আইন-কানুনে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। তাই প্রয়োজন প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রশাসন চালাবার বদলে যথাসম্ভব জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিজ ব্যবস্থা সঞ্চালন। এর জন্য দরকার দেশের সংবিধানে পরিবর্তন করে অধিকতম ক্ষমতা—যেসব প্রশ্নের সঙ্গে তাঁদের নিত্য দিনের সম্বন্ধ তার অধিকার জনসাধারণের স্থানীয় প্রশাসনিক একম্ (unit) গ্রাম পঞ্চায়েত বা নগরের পল্লীভিত্তিক সংগঠনের হাতে দেওয়া। গ্রাম থেকে অঞ্চল (নগরের পল্লী থেকে পুরো শহর), ব্লক, জেলা, রাজ্য হয়ে কেন্দ্র পর্যন্ত ক্ষমতা আজকের মতো উত্তরোত্তর বাড়ার বদলে ক্রমশ কমবে। কেন্দ্রের হাতে শেষ অবধি প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ও মুদ্রাব্যবস্থার মতো যথাসম্ভব সীমিত বিষয় থাকবে।

বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং বিশেষত জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত সমস্যাবলীর দায়িত্ব তাদের আয়ত্তে আছে এমন স্থানীয় প্রশাসনের হাতে গেলে প্রশাসনযন্ত্র এবং যাদের জন্য প্রশাসন বা ব্যবস্থা তারা মুখোমুখি হবে। এতে বর্তমানের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রশাসনযন্ত্রে বহুলাংশে মানবীয় সংবেদনশীলতার প্রবর্তন হবে public accountability বা জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে। কিন্তু কেবল এতে কাজ হবে না। গ্রাম বা শহরের পল্লীর প্রাথমিক প্রশাসনের একমের ক্ষেত্রে তো বটেই, উপরের দিকের প্রশাসনেও বেতনভোগী প্রশাসনকর্মীর বদলে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দ্বারা সমাজের প্রয়োজনীয় কর্ম করার প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। পশ্চিমের বহু গণতান্ত্রিক দেশে যথার্থ কর্তৃত্বসম্পন্ন শেরিফ, মেয়র, তাঁদের সহকর্মীরা, শিক্ষক, ট্রাফিক-পুলিশ এবং এমনকী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পুলিশদের দায়িত্ব এবং অন্যবিধ দায়-দায়িত্ব পূর্ণ ও আংশিক সময়ের স্বেচ্ছাসেবকরা পালন করেন। গণতন্ত্রের সঙ্গে "গণ"-কে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করার এই

প্রক্রিয়ার অনুশীলন বিনা গণতন্ত্র হয় পার্টিতন্ত্র অথবা আমলাতন্ত্র কিংবা উভয়ের এক সম্মিলিত অসংবেদী রূপে পর্যবসিত হবে।

হিংসার পথের বিকল্প

বিচার-মন্থনের তৃতীয় বিষয়টি হল সর্বথা হিংসা পরিহার। বিজ্ঞানের সঙ্গে হিংসার সংযোগ ঘটায় এ যুগে তার স্বরূপ এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে মানবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি তো বটেই, স্বয়ং মনুষ্যসহ তাবৎ প্রাণীর অস্তিত্বের সামনেই এক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। সুতরাং সচেতনভাবে সর্বথা হিংসাকে বর্জন না করলে মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সমাজে আর্থিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং অন্যবিধ কারণে পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতের অবকাশ থাকবেই। প্রশ্ন হচ্ছে—সেইসব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নিরাকরণের জন্য এযাবৎ প্রচলিত হিংসার পথের শরণ নেওয়া হবে, না কোনো বিকল্পের অনুসন্ধান করা হবে? হিংসার পথের শেষ পরিণতি মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনা। তাই বিকল্পের খোঁজ। এবং এই বিকল্পের আবিষ্কার ও প্রয়োগের ইতিহাস দৃশ্যমান প্রতিবিধানের উপায় হিংসারই সমসাময়িক। আমরা অহিংসার কথা বলছি—প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি না দিলেও যে নীতিকে আমরা প্রতিনিয়ত পরিবারের মধ্যে, প্রতিবেশী সমাজে এবং মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা বৃহত্তর সমাজেও পালিত হতে দেখছি। পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কারণ দেখা দিলে অহিংসা অর্থাৎ বিরোধী দৃষ্টিকোণকে বুঝে একত্র থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থাপিতকরণ (adjustment) অর্থাৎ দুটি বিরোধী ভূমিকার মধ্যে একটি সামান্য (common) অবস্থান খুঁজে বার করে তাকে আমরা গ্রহণ করে থাকি। পরিবারের মধ্যে হৃদয়াবেগের বশে যে আচরণ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, প্রতিবেশী এবং বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে তার সযত্ন অনুশীলন প্রয়োজন। এই সযত্ন অনুশীলনের নাম প্রেমশক্তি বা সত্যাগ্রহের বিকল্প। আর্থিক (শ্রমিক-মালিক, ক্রেতা-বিক্রেতা, উৎপাদক-উপভোক্তার স্বার্থসংঘাতে), সামাজিক (হিন্দু-মুসলমান, সবর্ণ-দলিত, শিয়া-সুন্নী, হিন্দু-শিখ ইত্যাদির প্রশ্নে) এবং রাজনৈতিক (নানা দলের ক্ষমতালোভের দ্বন্দ্বে)—সর্ববিধ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের সার্থক প্রয়োগ দ্বারাই হিংসার প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এইটাই একমাত্র কার্যকর পন্থা। বলা বাহুল্য, স্থানীয় ছোটো-ছোটো বিরোধ অহিংসার পন্থায় মেটাবার কৌশল যদি আমরা প্রথমে আয়ত্ত করতে না পারি, তবে বিশ্বশান্তির মতো বৃহত্তর ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের উদ্দেশ্যে অহিংসার প্রয়োগের কথাই উঠতে পারে না। তাই হিংসা সর্বথা পরিত্যাজ্য এবং সর্বদা সচেতন চিত্তে অহিংস অসহযোগের দ্বারা স্থানীয় হিংসার সম্মুখীন হওয়া।

সমাজবাদী মানুষ ও সমাজবাদী সংস্কৃতি

আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নবযুগ আনার পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার আধার হল নূতন মানুষ। যেন-তেন প্রকারেণ কাঠামো বদলালেই নূতন মানুষ ও নব সভ্যতা-সংস্কৃতির উদয় হবে—এই বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, তা অতীতের বহু বিপ্লবের ইতিহাসেই দেখা গেছে। এর সর্বাধুনিক উদাহরণ হল পূর্ব ইউরোপ আর সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদের সাত দশকেরও বেশি সময়ের বজ্র আঁটুনির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফস্কা গেরোতে পর্যবসিত হওয়া। আমাদের চোখের সামনে ফলিত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাসাদ যে এমনি তাসের কেল্লার মতো ধসে পড়ল তার বড়ো একটা কারণ—ওই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমাজবাদী মানুষ তথা সমাজবাদী সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি। ওইসব দেশের মানুষও ধনতান্ত্রিক দেশের মতোই সমান উপভোক্তাবাদী (consumerist)। ভোগ্য উপকরণের ক্ষেত্রে তাদের দেহি! দেহি! আবেদন শেষ অবধি মূলধনী বাজারের অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে তাদের বাধ্য করেছে। কিন্তু এই কারণও কত দিনের জন্য? উপভোক্তাবাদী বৃত্তির সীমা নেই, অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। এক দিকে বর্তমান অর্থব্যবস্থা ও সভ্যতার অপরিহার্য উপাদান জ্বালানি তেল আর ধাতুর আকরের পরিমাণ সীমিত—এর সৃষ্টি নূতন করে হচ্ছে না বলে আজ নচেৎ কাল এর ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে। অন্য দিকে আরও ভোগের বাসনায় বন-জঙ্গল নাশ করে, top soil বা মাটির উপরের যে আঠারো ইঞ্চি পরিমাণ জমির ফসল ফলাবার ক্ষমতা আছে এবং নূতন করে যে top soil গড়ে উঠতে হাজার-হাজার বছর সময় লাগে, ভ্রান্ত কৃষি ও জলনিয়ন্ত্রণনীতির জন্য তার অবক্ষয় হতে দিয়ে মরূকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে ও রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার দ্বারা জলের উৎসকে বিষিয়ে দিয়ে এবং ওরকম আরও নানা ভাবে আরও ভোগের উপকরণ পাবার জন্য পূর্বাপর পরিণাম চিন্তা না করে প্রকৃতির নির্বিচার শোষণ করে শুধু মানব-প্রজাতিই নয়, তাবৎ জীবিত প্রাণীর মৃত্যুর আয়োজন এই পুঁজিবাদী সংস্কৃতি উপভোগবাদ দেশে-দেশে করে চলেছে। সংযম ছাড়া আত্মহননের এই প্রক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। সংযমই মানুষকে প্রাকৃতিক বিধানের অনুকূল জীবনযাত্রা গ্রহণে অনুপ্রেরিত করবে। আর সংযমের মূলে আছে নৈতিকতা। ব্যক্তিজীবনের নৈতিক আধার ব্যতিরেকে সমাজ থেকে কেবল নেবার মানসিকতা যা শেষ অবধি অমানবীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বৃত্তি, অপরকে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করে নিজে ভোগ করার ইচ্ছা ও অন্যবিধ দুর্নীতি জন্ম দেয় তার হাত এড়ান যায় না। নৈতিকতার বলে সমাজকে বেশি করে দেবার বৃত্তির অনুশীলন করতে হবে। নূতন সমাজের কাঠামোর পুনঃরচনার প্রয়াসের সঙ্গে-সঙ্গে তাই নূতন মানুষ গড়ার—মানুষকে নৈতিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টাও শুরু করতে হবে। কারণ নূতন মানুষ ছাড়া নবীন আর্থিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো সাকার হতে পারে না। গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের বিচার-মন্থনের এইটাই ছিল চতুর্থ সূত্র।

চার

গান্ধীর চ্যালেনজের দু-দফা অভিযান

পূর্বোক্ত চারটি সূত্র অবলম্বনে প্রচলিত ব্যবস্থার এক আমূল বিকল্প সাধারণের সামনে তুলে ধরাই ছিল গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের লক্ষ্য। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, গোড়ায় লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ খ্রী ২ থেকে ১১ই নভেম্বর অর্থাৎ দশ দিনের মধ্যে ভারতের এক লক্ষ গ্রামে (শহরের পাড়াও এর মধ্যে পড়ে) জনসাধারণের কাছে বিকল্প আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই বাণী পৌঁছে দিয়ে তাঁদের এই লক্ষ্যপূর্তির উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল করে তোলাই ছিল গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের অভীষ্ট। অকটোবর মাসে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা আদওয়ানিজীর রামরথযাত্রার পিছু-পিছু দেশের নানা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার জন্য গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযান ব্যাহত হয়। অভিযানের প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তে এবং অভিযানের দিনগুলিতেও বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার যে পরিবেশ এবং তার জন্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার জন্য দশ দিনে লক্ষ্যের বড়ো একটা অংশের পূর্তি করা সম্ভব হয় নি। তাই দ্বিতীয় দফায় অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৯১ খ্রী ৩০শে জানুয়ারি থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

তবে দেশে আকস্মিক ওইভাবে দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠার জন্য অভিযানের উভয় চরণেই বিচার-মন্থনের তৃতীয় সূত্রটি—সর্বথা হিংসা পরিহার—অগ্রাধিকার পায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সবার চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে দেশের রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক সংহতি কত দুর্বল। দ্বিতীয় চরণের এক সর্বভারতীয় কর্মসূচী ছিল ১৯৯১ খ্রী ১৯ই জানুয়ারি অযোধ্যার যে মসজিদ-মন্দিরকে উপলক্ষ করে দেশ-জোড়া ওই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, সেখানে গান্ধীজীর সর্ব-ধর্মসমভাবের বাণী প্রচার করা হবে "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম / সবকো সম্মতি দে ভগবান" নীতির অনু-সরণে। একশ জনের মতো হিন্দু-মুসলমান এবং স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে নবীন আর প্রবীণ গান্ধীপন্থী সমবেত হয়েছিলেন অযোধ্যায় এই উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু মর্যাদা পুরুষোত্তম রামের নামে এমন বিদ্বেষ-বিষ ছড়ানো হয়েছিল যে উপবাসী প্রার্থনারত গান্ধীপন্থীদের উপর দৈহিক আক্রমণ করা হয়। "কর-সেবক" হবার দাবিদার এক দল যুবক তারা গান্ধীর নয়, গান্ধী হত্যাকারী গডসের উপাসক ঘোষণা করার সঙ্গে-সঙ্গে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিতপাবন সীতারাম" ভজন গানেরত গান্ধীপন্থীদের মারধর করে এবং তাঁদের শামিয়ানা ভাঙচুর করার সঙ্গে-সঙ্গে চরখা-সহ তাঁদের জিনিসপত্র ইতস্তত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পুলিশ সেখানে উপস্থিত থাকলেও প্রথমে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নেয়। আর পরে অহিংস ও প্রহৃত গান্ধীপন্থীদেরই শান্তিভঙ্গ করার কারণ মনে করে আটক করে জোর করে অযোধ্যার বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে। তাঁদের পক্ষে পরবর্তী দিনগুলির কর্মসূচি পালন করা সম্ভব হয় নি। যাই হোক, অযোধ্যার ঘটনা গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের বিবরণে প্রসঙ্গত এসে পড়েছে। আমরা মূল ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করব।

কয়েকটি রাজ্যে গ্রাম ও শহরে অভিযানের বিবরণ

কয়েকটি রাজ্যে—যেখানে অভিযান জনমানসে বিশেষ দাগ কাটতে সমর্থ হয়, তার কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হবে। মহারাষ্ট্রে ২১টি জেলার ২৬৮১টি গ্রামে পৌঁছানো হয়। কর্মীদের প্রাদেশিক স্তরে ১টি, জেলার স্তরে ২৬টি এবং ব্লক স্তরে ৫০টি শিক্ষাশিবির আয়োজিত হয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলিতে অভিযানের খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মারাঠি সর্বোদয় পত্রিকা "সাম্যযোগ"-এর অভিযান সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যা ছাড়াও দুটি পুস্তিকা, একটি ফোল্ডার, পোস্টার এবং স্টিকারের মাধ্যমে অভিযানের বাণীর প্রচার হয়। যুবক আর নূতন কর্মীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং তাঁরা গান্ধী আদর্শে একটি যুবসংগঠনও গড়েছেন। গুজরাতে ৯০০০ গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব হয়। অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতির সময়ে গ্রামের বাড়ির ৮০ হাজার দেওয়ালে গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী লেখা হয়, যার মধ্যে স্বভাবত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণীও ছিল। কিন্তু বহু স্থলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা—বিশেষ করে তরুণ যুবকেরা—সেসব বাণী মুছে ফেলে "হিন্দু জাগা, মুসলিম ভাগা" জাতীয় বক্তব্য লেখে। গান্ধীজীর গুজরাতে সাম্প্রদায়িকতা কী গভীর শিকড় ছড়িয়েছে, এবং বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে, এ তার একটি নিদর্শন। অভিযানের সময়ে ৫৪টি গ্রামে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর আদর্শ প্রচার করা হয়। অভিযানের বাণী-বাহক, তিনটি গুজরাতি পুস্তিকা ছাড়াও গুজরাতি সর্বোদয় পত্রিকা "ভূমিপুত্র"-র বিশেষ সংখ্যার ১ লক্ষ কপি বিক্রি করা হয়। "ভূমিপুত্র"র ৬৭০ জন নূতন গ্রাহক পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আদওয়ানিজীর রাম-রথযাত্রার পরিণামস্বরূপ গুজরাতে ব্যাপক সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা ঘটে। তাই অভিযানের দ্বিতীয় চরণে কর্মীরা প্রধানত দাঙ্গাপীড়িত এলাকাগুলিতে গিয়ে সম্ভাবনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ১০ই ফেবরুয়ারি আহমেদাবাদের সরস্বতী হরিজন আশ্রমে রাজ্য স্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্মেলন হয়, যাতে গঠনকর্মীরা ছাড়াও কংগ্রেস জনতা কমিউনিস্ট দলগুলি এবং র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্টদের মতো নির্দলীয় কর্মীরাও যোগ দিয়ে গুজরাত থেকে দাঙ্গার অভিশাপ দূর করার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। প্ল্যাকার্ড, প্রদর্শনী, নাটক, মানব-শৃঙ্খল রচনা ইত্যাদির দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার করার সঙ্গে-সঙ্গে রমজানের সময়ে মুসলমান প্রতিবেশী-বন্ধুদের ইফতারে আমন্ত্রণ জানানো এক বিশেষ কর্মসূচি ছিল। আদওয়ানিজীর রথযাত্রার জন্য উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও ভরুচ জেলায় বহু মুসলমান অভি-যানের পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষ-পীড়িত গুজরাতে ওই জেলার পালেজ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী বালন গ্রামের একটি প্রেরণাদায়ী উদাহরণ হল লনডনপ্রবাসী ওই এলাকার মুসলমানরা গ্রামের মন্দিরটির সংস্কারের জন্য ৯০ হাজার টাকা চাঁদা পাঠান এবং গ্রামের মুসলমান সরপঞ্চ আর-সবার সাহায্য নিয়ে মন্দির-সংস্কারকার্যের নেতৃত্ব দেন। গুজরাতের অভিযানের কর্মীদের অভিজ্ঞতা হল—মুসলমানরা সভা ও শিবিরে যোগদান করেন, কিন্তু কোথাও এজাতীয় কর্মসূচির নেতৃত্ব নিতে চান না। সম্ভবত ভয়ে তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে রাখেন। আর সর্বধর্মপ্রার্থনায়ও তাঁরা যোগ দেন না।

মধ্যপ্রদেশের কর্মীরা ৪০টি ব্লকের ৭০০০ গ্রামে চ্যালেনজের বাণী নিয়ে উপনীত হন এবং প্রায় এক হাজার নূতন কর্মীদের নিজেদের মধ্যে পেয়েছেন। ইতিমধ্যে আদওয়ানিজীর রথযাত্রার চক্রচিহ্ন ধরে মধ্যপ্রদেশে এবং বিশেষ করে ইন্দোরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সর্বোদয় কর্মীরা সর্বশক্তি নিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে এবং দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের সেই সাহসিকতার কাজ কেবল জনসাধারণ এবং সরকারেরই স্বীকৃতি পায় নি, দূরদর্শনও তাঁদের শান্তিসৈনিকের কাজের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে। মধ্যপ্রদেশের অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলমান অধ্যাপক আর অপর একজন অধ্যাপিকা প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইন্দোরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে পরিবেশ সর্বোদয়ের কর্মীরা তৈরি করেছেন তার আর-একটি উদাহরণ ১৯৯১ খ্রী ১৮ই জানুয়ারি মূলত হিন্দু-অধ্যু-ষিত একটি বস্তির আগুন নেভাতে ১৯ বছর বয়সের এক মুসলমান যুবকের আত্মাহুতি। রাজস্থানে ৪৫০০ গ্রামে অভিযানের বাণী পৌঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গে নানা স্থানে নাটকাভিনয় এবং লোকসঙ্গীতের দ্বারা সাম্প্র-দায়িক ঐক্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে অভিযানের অনুকূলে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে রাজস্থানের কর্মীরা আগামী পাঁচ বছর গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী নিয়ে গ্রামে-গ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হরিয়ানায় ৩৮১টি গ্রামে অভিযানের বাণী পৌঁছানো হয় এবং পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ১২৫টি গ্রামে ৫৬টি শিক্ষা-শিবির আয়োজিত হয়। শিখ, মুসলমান এবং হরিজনদের মধ্যে থেকে নূতন কর্মী পাওয়া গেছে।

●

তামিলনাড়ুতে অভিযানের পূর্বপ্রস্তুতি শুরু হয় ১৯০৯ খ্রী. ২১ এপ্রিল ত্রিচিতে কর্মীদের প্রাদেশিক শিক্ষাশিবির থেকে। অভিযান শুরু হওয়ার পূর্বেই রাজ্যের ২৫টি জেলার সবগুলিতেই জেলা-স্তরের শিক্ষাশিবিরের অনুষ্ঠান শেষ হয়। চারটি জনপ্রিয় তামিল দৈনিক পত্রিকা—"দিনমণি", "দিনমালার", "মাদুরাই মণি" ও "মালাইমুরাসু"তে অভিযানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইসব পূর্বপ্রস্তুতির ফলে তামিলনাড়ুতে অভিযানের সপক্ষে প্রবল জনমত তৈরি হয়। গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী অভিযানের প্রথম দশ দিনে ৬০০০ গ্রাম, ৩০টি শহরের ১০৫টি ওয়ার্ডে পৌঁছে দেওয়া হয় পদযাত্রী এবং সাইকেলযাত্রীদের দ্বারা। এ ছাড়া, বহু সভা, সম্মেলন, সেমিনার, পথনাটক, সর্বধর্মশান্তিপ্রার্থনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান্ধীজীর বাণী জন-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর কর্মীরা বিশেষ করে সম্পূর্ণ মদ্যনিষেধের উপর জোর

দেন, কারণ সরকারের অবাধ মদ্য বিক্রির ব্যবস্থা জনসাধারণের আর্থিক সর্বনাশ ঘটাবার সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক বিপত্তিরও কারণ হয়েছিল। অবাধ মদ্য বিক্রির দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত নারীসমাজের আগ্রহে ওই কর্মসূচির উপর জোর দেওয়া হয়। সমগ্র রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার যুবক-যুবতী গান্ধীর পথে কাজ করার জন্য পূর্ণ বা আংশিক সময় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের কাজে লাগানোই বর্তমানে তামিলনাড়ুর অভিযানের কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব। জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখে ১৮ থেকে ৪০ বছরের উৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি যুবসংগঠন তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে ২৫ জন হিসাবে অন্তত ১ লক্ষ সেবকের এক বাহিনী তৈরি করা যায়। কেরলে দুই সর্বোদয় নেতা গোপীনাথন নায়ার এবং উমর কোয়ার নেতৃত্বে দুটি বাহন যাত্রা রাজ্যের সবগুলি জেলায় গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী পৌঁছে দেয়।

বিহারের ২৫টি জেলায় ৫ হাজারের কিছু বেশি গ্রামে গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়, যদিও মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন এবং মন্দির-মসজিদ বিবাদকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার পরিবেশ ছিল। সর্বোদয় ও খাদির কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ নাগরিকরা বহুল সংখ্যায় অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। ৩০০ জনের উপর নূতন কর্মী পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৩০ জন মহিলা এবং প্রায় ৪০ জন মুসলমান সমাজের থেকে। বিহারের গ্রামাঞ্চল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ এবং সর্বোদয় সহ গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলি শোষিত-পীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষদের সক্রিয় সাহায্য দিতে না পারায় জঙ্গি মার্কসবাদীরা গ্রামাঞ্চলে শক্তি সঞ্চয় করছে—এটা প্রত্যক্ষ হয়েছে। মুঙ্গেরে আদিবাসী মহিলাদের ভিতর মাদক সেবনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন লক্ষ করা গেছে। ভাগলপুর মুঙ্গেরে গত বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে ২০৬টি গ্রাম থেকে মুসলমানরা উদ্বাস্তু হন, সর্বোদয় কর্মীদের নিরন্তর পুনর্বাসনপ্রয়াস সত্ত্বেও তার ১০০টিতে এখনও মুসলমানদের পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয় নি। স্থানীয় উদ্ধণ্ড ব্যক্তিরা হিন্দু মৌলবাদীদের ছত্রছায়ায় এতে বাধা দিচ্ছে। সর্বোদয় কর্মীদের প্রয়াসে ১৩-১৪ এপ্রিল (১৯৯১ খ্রী.) জনসম্মেলনের পর যাতে স্থানীয় নারীসমাজ ও মুসলমানেরাও ব্যাপকভাবে যোগদান করেন, অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে অভিযান

পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলার ৪৫টি ব্লকের ১২৫০টি গ্রামে গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী নিয়ে পৌঁছানো হয়। এর মধ্যে কলকাতা ও মেদিনীপুর শহরের ৫টি ওয়ার্ডও ছিল।

বর্তমান লেখকেরও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানে যোগ-দান করার সুযোগ ঘটেছিল। তিনদিন পূর্বপ্রস্তুতির পর কমিসভায় অভিযানের নানা দিক সম্বন্ধে বোঝানো ছাড়াও মূলত রানীনগর ব্লকের চক-ইসলামপুর ও নগর এলাকার আশেপাশের গ্রামগুলিতে এবং বীরভূম জেলার রামপুরহাটকে কেন্দ্র করে তার সন্নিহিত গ্রাম-গুলিতে স্থানীয় খাদি-কর্মীদের দ্বারা আয়োজিত অভিযানের কর্মসূচিতে যোগদান করেছিলাম। অভিযানের অঙ্গ ছিল গান্ধীর চ্যালেনজের বাণী-বাহক প্লাকার্ড-ফেস্টুন সহ শোভাযাত্রা, এর অনুকূল স্লোগান দেওয়া, এর বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী ইস্তাহার বিলি এবং গ্রামবাসীদের (একটি শোভাযাত্রা ও সভা বহরমপুর শহরেও হয়েছিল) সভায় এ সম্বন্ধে বলা। প্রতিদিন এর জন্য দশ থেকে ষোল কি.মি. পর্যন্ত পদযাত্রা করতে হয়।

অভিযান শুরু হবার প্রাক্কালে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবকদের আত্মদহন সহ হিংসাত্মক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আদওয়ানিজীর

রাম-রথযাত্রার চক্রচিহ্ন ধরে প্রথমে গুজরাত ও উত্তর প্রদেশ এবং তারপর ভারতের অন্যত্র ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। দেশ স্বাধীন হবার মুখে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দাঙ্গা ও চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং হিন্দু এবং মুসলিম মানসকে যেমন বিভক্ত দেখে-ছিলাম, সেই রকম পরিস্থিতি আবার লক্ষ করলাম ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের প্রথমে। পরিস্থিতি দেখে অভিযানের চারসূত্রী বক্তব্যের উপর সমান জোর দেবার বদলে একটি—হিংসা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিবাদজাত হিংসার সমস্যার উপর কর্মী ও জনসভার বক্তৃতায় জোর দিতে মনস্থ করি। সঙ্গে-সঙ্গে কর্মসূচীর আয়োজক খাদি কর্মীরা ছিলেন এবং এইসব এলাকায় খাদির কাজ ব্যাপক বলে খাদি-গ্রামোদ্যোগের যৌক্তিকতা—সবার জন্য কাজের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এসেই গিয়েছিল। খাদির কাটুনি বয়নশিল্পী এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছে তাঁদের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলায় সাম্প্রদায়িক শান্তির যৌক্তিকতা বোঝাতে অসুবিধা হয় নি। যেমন—চক ইসলামপুর গ্রামের রেশমের বয়নশিল্পীরা প্রধানত হিন্দু। কিন্তু তাঁদের সূতা সরবরাহ করেন মালদার জালালপুর-সুজাপুর-বিরাম-পুর অঞ্চলের মুসলমান রেশমগুটির বসনি (পালক) এবং কাটুনি পাকদাররা। এ ছাড়া মটকা এবং কার্পাস মসলিনের মহিলা কাটুনিদের বড়ো একটা অংশ মুসলমান। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক সহযোগিতা, যা উভয় সাম্প্রদায়ের মানুষের রুজি-রোজগার আর বাঁচার জন্য অপরিহার্য, তা একটু বুঝিয়ে বলতেই তাঁরা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। অনুরূপভাবে নগর-মাড়গ্রামের খাদি রেশমের বয়ন-শিল্পীরা অধিকাংশ মুসলমান। তাঁদের কাপড়ের বড়ো গ্রাহক বিহার-উত্তর প্রদেশ-দিল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা। ঠিক দুর্গাপূজা (দশেরা) এবং দেওয়ালীর সময়ে ওইসব অঞ্চলে জাতি ও ধর্মের নামে দাঙ্গা বেধে যাওয়ায় না খাদি ভাণ্ডারগুলি খোলা সম্ভব হয়েছিল আর না ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে নগর-মাড়গ্রামের খাদি রেশম উৎপাদক মুসলমান বয়নশিল্পীদের সমবায় সমিতি প্রাপ্য টাকা পাচ্ছিল। ফলে তাঁদের ঘরে অনটন। হিন্দু ও মুসলমানদের এই স্বাভাবিক পরস্পর-নির্ভরতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার অপরিহার্যতা এবং দাঙ্গা ও হিংসা বর্জন করার যৌক্তিকতা বোঝাতে তাই ওই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও কষ্ট হয় নি।

দুটি জেলার যেখানেই গেছি রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদের বিবাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু মৌলবাদের সংগঠিত রূপ চোখে পড়েছে। কর্মী ও জনসভার বক্তৃতায় আমাকে তাই প্রবল ভাবে ওই বিবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলার সময়ে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার চেষ্টা করতে হয়। বিশেষ করে চক-ইসলামপুর গ্রাম ও তার আশে-পাশে অযোধ্যায় "করসেবক" পাঠানোর নামে হিন্দু মৌল-বাদকে সংগঠিত করার প্রকাশ্য প্রয়াস ছিল। খবর পাচ্ছিলাম হিন্দু মৌলবাদীরা আমাদের বক্তব্যে নারাজ এবং তাই আমাদের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু সম্ভবত আমাদের সংগঠন ও যুক্তির শক্তি দেখে তাঁরা আশ-পাশ থেকে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও সামনা-সামনি চ্যালেনজ জানান নি। দুটি জেলাতেই হঠাৎ এইভাবে হিন্দু মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় সাধারণ খেটে-খাওয়া (আমরা রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীদের খুব একটা সংস্পর্শে আসি নি) মুসলমান গৃহস্থদের বেশ ভীতিপীড়িত দেখেছিলাম। এই অবস্থায় "হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই / মিল-মিশে বাঁচতে চাই" এবং ওই জাতীয় স্লোগান দিয়ে আমাদের প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করে ঘুরতে দেখে এবং মসজিদ ভেঙে বা "সরিয়ে দিয়ে" মন্দির গড়ার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলতে দেখে সেইসব সাধারণ কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক-ছোটো দোকানদার মুসলমানেরা খুবই বল-ভরসা পেয়েছিলেন এবং আমাদের সভা-শোভাযাত্রা-

গুলিতে মন খুলে যোগ দিয়েছিলেন। কয়েক জন মুসলমান শিক্ষক আগ্রহ-সহকারে আমাদের সভা-গুলিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুন্দর বক্তব্যও পেশ করেছিলেন। পূর্বেই যেমন বলেছি, দেশের তখনকার অবস্থা দেখে দেশের সর্বত্রই আমাদের সহকর্মীরা হিংসা বা দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ব্যাপক প্রচার করেন। ৬০ হাজার গ্রাম এবং কয়েকটি শহরে এইরকম বিধিবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের ব্যাপক প্রচার দেশের তখনকার বিদ্বেষের আগুনকে প্রশমিত করার সহায়ক হয়েছিল—এমন দাবি করা অযৌক্তিক হবে না।

পাঁচ

উপসংহার

উপসংহারপর্বে অভিযানের সামগ্রিক মূল্যায়ন করায় চেষ্টা করা হবে।

দেশের মানুষ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের সম্বন্ধেই মোহমুক্ত। কিন্তু সামনে কোনো বিকল্প না থাকায় কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের খেলা খেলতে বাধ্য হয়। সুতরাং গান্ধীর চ্যালেনজ-এর মতো একটি রাজনৈতিক-দল-নিরপেক্ষ অভিযান—দেশবাসীর বর্তমান গুরুতর সমস্যাবলী সম্বন্ধে যার একটি বিশিষ্ট বক্তব্য ও কর্মসূচি আছে—তার প্রতি চিন্তাশীল সাধারণ মানুষের বেশ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। কিন্তু সে আগ্রহ এখনও এমন প্রবল হয়ে ওঠে নি যে তা প্রস্তাবিত জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। গঠনকর্মীদের সংখ্যা বা শক্তি এমন প্রবল নয় যে সর্বভারতীয় স্তরে কেবল তাঁরা এজাতীয় কোনো আন্দোলনের অনুঘটক হতে পারেন। বিশেষ করে গঠনকর্মীদের একটি বড়ো দুর্বলতা হল এই যে তাঁরা নিজ নিজ বিশিষ্ট কাজ (যথা খাদি, গ্রামোদ্যোগ, বয়স্ক শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন বা গ্রামসেবা ইত্যাদি) নিয়ে এত আত্মমগ্ন থাকেন যে গান্ধীর চ্যালেনজের মতো কোনো অভিযানে সাময়িকভাবে ধরেবেঁধে না নামলে গঠনকর্মের সামগ্রিক রূপ সামনে রেখে কাজ করতে পারেন না। সুতরাং সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানের মূল নীতিতে জনসাধারণের যে নিষ্ক্রিয় সমর্থনের পরিচয় পাওয়া গেছে তাকে সক্রিয় করে তোলা।

এর একটা পন্থা হল—যেসব নূতন কর্মীর সংস্পর্শে আসা গেছে এবং যাঁরা এ আন্দোলনের জন্য সময় দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং মাঝে-মাঝে প্রশিক্ষণ-শিবির ও সভা-সমিতির আয়োজন করে তাঁদের সক্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করা। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত প্রমুখ কয়েকটি রাজ্যে এর জন্য তৎপর হওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আরও ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য রাজ্যে এতদভিমুখী পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব ঘটলে অভিযানের মূল বক্তব্যের প্রতি প্রকট এই সদিচ্ছার প্রভাব বেশি দিন থাকবে না।

নিজ-নিজ রুটিন কর্ম ও প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি ভেঙে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত ভাবে জনসাধারণের সামনে যাওয়া এবং তাঁদের সামনে যেসব জ্বলন্ত সমস্যা তার স্বরূপ বোঝা ও তার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা-আলোচনা করা গঠনকর্মীদের পক্ষে খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই প্রক্রিয়াকে জারি রাখা। সর্বভারতীয় স্তরে গান্ধীর চ্যালেনজ অভিযানকে জারি রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু নীচের তৃণমূল স্তরে অভিযান সক্রিয় না থাকলে কেবল উপরের সিদ্ধান্তে কাজ হবে না। অভিযান জারি রাখার সিদ্ধান্তের দুটি কর্মসূচির প্রথমটি হল দেশে অন্তত একশ ক্ষেত্র গড়ে তোলা যেখানে স্থানীয় মানুষ-দের সঙ্গে নিয়ে গঠনকর্মীরা অভিযানের চারসূত্রী আদর্শের প্রত্যক্ষ রূপায়ন করবেন। রাজ্যে-রাজ্যে এর জন্য প্রাথমিক কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল দেশের অন্তত তিনশটি জেলায় ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে মন্থনের এই প্রক্রিয়াকে আরও নিবিড়ভাবে কার্যকর করার জন্য ছাত্র-যুবক-মহিলা, শ্রমিক কৃষক কর্মপ্রার্থীসহ তাবৎ দরিদ্র শ্রেণী-দের জন্য প্রশিক্ষণশিবির আয়োজিত করা। এখানে জাতীয় সমস্যাবলী (সুশাসন নয়, স্বশাসন; প্রশাসনের সর্বস্তরে দল নয়, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ; সকলের কর্মসংস্থান এবং বাসগৃহ শিক্ষা স্বাস্থ্যের জন্য আয়োজন, শান্তি-শৃঙ্খলা আর সদ্ভাবে থাকার প্রশ্ন ইত্যাদি) নিয়ে গভীর আলোচনা হবে এবং কেবল সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলি নয়, জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে কী করতে পারেন তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যান্বিত করার ব্যবস্থা হবে। এই কার্যান্বয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উপযুক্ত জনচেতনার সমর্থন পেলে পরিবেশদূষণ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে, নাগরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত (caste) সদ্ভাব বজায় রাখতে এবং দারিদ্র্য নিরাকরণের জন্য অহিংস সত্যাগ্রহের শরণ নেবার গভীর সম্বন্ধ থাকবে। মূল কথা জনশক্তিতে জনতার স্বাধিকার অর্জন ও শোষণ বন্ধ করা।

গান্ধীর চ্যালেনজের সাফল্য বা ব্যর্থতা কেবল গঠনকর্মীদের চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার নয়। ভারতের গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ন ও জনশক্তির জাগরণ এবং সদা সক্রিয় হবার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত সবারই তাই এ ব্যাপারে কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৬ সালে বিহারের চক্রধরপুরে। ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরই অগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। টাটানগরে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৪৫ খ্রী; পরে বিহারের সিংভূম জেলায় কংগ্রেসের পুরো সময়ের কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। '১৯৫১ সালে ব্রতী হন অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের কর্মীরূপে খাদি ও পল্লী পুনর্গঠনের কাজে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গান্ধী স্মারক নিধির সম্পাদক।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে প্রায় তিরিশটি গ্রন্থের রচনাকার। এর মধ্যে "জিন্না, পাকিস্তান: নূতন ভাবনা" গ্রন্থের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৮ সালে। এ ছাড়াও "বাঙলা ও বাঙালী", "বাংলাদেশ! বাংলাদেশ!" "সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ", "গান্ধীজীর গঠনকর্ম", "সত্যাগ্রহের কথা", "বিপ্লবী বন্ধুর প্রতি" ইত্যাদি মৌলিক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

চলচ্চিত্র

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

মেঝে পর্যন্ত লোটানো পর্দায়
উজ্জ্বল রঙিন তুষারমৌলি ভাঁজে-ভাঁজে বিপুল পরাক্রান্ত
ছবির মতো ঘর সাজানো গোপন আলোতে
এক দেওয়ালে পরিতৃপ্ত পরিবার আইফেল টাওয়ারের নীচে
অন্য দেওয়ালে হাজার-হাজার সূর্যাস্ত অ্যাক্রিলিকে আঁকা
সিলিঙের সিন্থেটিক সন্ধ্যার মহার্ঘ আকাশ থেকে
দুষ্প্রাপ্য মহানাগের মতো নেমে এসেছে
বহুবর্ণদ্যুতির আশ্চর্য আলোর ঝাড়
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের সুগন্ধি বাতাসে
উৎসহারা পিয়ানোর মদির মূর্ছনা
উৎসবের পরিপূর্ণ আয়োজন।

একে-একে অতিথিরা জড়ো হতে লাগলেন—
সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পর্দার নীচে একলা পড়ে থাকা
বেমানান বাঁশের সরু একটা টুকরো কারও পায়ে ঠেকল
কুড়িয়ে নিয়ে দিলেন একজনের হাতে
তিনি দিলেন আরেকজনের হাতে
কী ভেবে একটু নেড়েচেড়ে তিনি ফুঁ দিলেন তাতে।

অমনই একা বাঁশির অদৃশ্য আঙুলের স্পর্শে
সরে গেল দেওয়াল-জোড়া পর্দার পাহাড়
চকিতে উন্মোচিত হল
গাঢ় রাত্রির সমুদ্রের অতিদূর তরঙ্গমালা
মধ্যে-মধ্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে
নিজেদের মধ্যে বিভোর তিমিদের জলকেলিতে।

অভিভূত অতিথি আবার ফুঁ দিলেন।
দূরের সমুদ্র সরে এল কাছে
অপসৃত পর্দার ঠিক ওপারে যেন হাতের নাগালে
নিরালোক নিঃস্তব্ধ নীল জলের প্রশান্ত প্রবাহে
অনেক মাছেদের ভিড়ে
কয়েকজন নগ্ন নরনারী
সাবলীল সাঁতার কেটে বেড়ায় আপন নিমগ্নতায়
তাদের শরীরের সহজ মোচড়ে-মোচড়ে উল্কা খসে পড়ে
শিসের মতো ঝিলিক টেনে মিলিয়ে যায়
কোন্ অজানা রাত্রির নিঃসীম অতলে
যেখানে অপার অন্ধকারে
অজস্র নক্ষত্রগ্রন্থি অনবরত সৃষ্টি করছে
অচরিতার্থ সব কামনা-বাসনায় জর্জরিত জটিল আবর্ত।

সম্মোহিত বাঁশির সূক্ষ্ম সুরে
সেই অসীম গভীর অন্ধ-চক্র থেকে
ক্রমশ উত্থিত হল অব্যর্থ এক আমূল মসৃণ মায়াবী তরঙ্গ
আলুলায়িত কেশপাশে কখনও ঢেকে দেয় মোহিনী নয়ন
কখনও ঢেকে দেয় বুকের বহু বিনিদ্র পূর্ণিমার নিঃসঙ্গ নিমন্ত্রণ
আবার কখনও অনাবৃত করে নাভিমূল যেখানে সুদূর রাত্রির
প্রগাঢ় তরঙ্গমালা বিভোর তিমিদের জলকেলিতে
উদ্বেলিত আবহমানকাল।
সে কি কোনও চেনা নারী অথবা প্রতিবেশিনী কিংবা বিদেশিনী
নাকি সে সমস্ত আকাশ ও সমুদ্রের মোহনায়
পরিব্যাপ্ত অনন্ত অন্ধকারের একমাত্র দেবী অধীশ্বরী?

একবার
শুধু একবার যে দেখেছে তাকে
চিরতরে ভুলে গেছে
পর্দার এপারে সাজানো সংসারে নিদ্রায় সম্ভোগে
পৃথিবীর সব সচ্ছলতা
পৃথিবীর সকল সফলতা।
মাঝখানে শুধু এক পর্দার ব্যবধান
শুধু এক পর্দার ব্যবধান॥

দর্শন

পরিমল চক্রবর্তী

মানবিক চৈতন্যের চকিত আভাস
বোধির গোচরে পেয়ে
মনে-মনে একদিন আমিও ভাবলুম,
অবিশ্বাসী মানুষকে খুব কাছে ডাকি ;
ডেকে এনে বলি, 'থামো,
বিতর্কে বিরত হও ;
দুটি মুগ্ধ চক্ষু মেলো পরিপূর্ণ—
মেলে ছাখো অপরূপ বিশ্বচরাচর।
ঈশ্বরের মায়াস্পর্শে আবিষ্ট সংসারে
আমাদের এ-প্রবাসে কল্পান্তের কাহিনীর মতো
নিগূঢ় সংকেতে ভরা ;
নিসর্গপ্রসৃষ্টি জুড়ে পরিস্ফুট এই যে সংকেত,
ভাষা কি বুঝেছ তার এতটুকু ?'

সেই থেকে প্রায়ই আমি মনে-মনে ভাবি :
পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ
অমল চৈতন্যে কবে পরিশুদ্ধ হবে ?

আত্মপ্রকৃতি

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এখনো এখানে শিশিরের স্বাদ আছে
অভ্যাসে তাজা নয়নমণির ফুল
সরে আসা কেন তবু শ্মশানের কাছে
বিকেল এখনো চেয়ে থাকে নির্ভুল ;

আকাশ-ছড়ানো শঙ্খচিলের মেলা
দেখেছিল সে তো মৃত্যুর কিছু আগে
কবিতার প্রতি ছন্দহারানো খেলা
আজও যেন তার ভীষণ আপন লাগে ;

একা-একা দূর জীবন-ভাসানো মাঠে
এই তো সেদিন রক্তিম হয়ে ওঠা
রঙের কৌটো ফুরলেও বুঝি কাটে
মায়ের গন্ধ ছাড়ে না এ মাঠকোঠা ;

কপালে জ্বরের নরম জলের ছোঁয়া
বন্দিদেবতা চলেছিল নতমুখে
চারিদিকে শুধু ঘূর্ণিঝড়ের ধোঁয়া
কে যেন প্রথম টেনে নিয়েছিল বুকে ;

এখনো অনেক প্রজাপতিদের ভিড়ে
আসঙ্গলোভী নিমেষহারানো ফুল
একা-একা তাই ফিরে চলে যায় নীড়ে
বিকেল এখনো চেয়ে থাকে নির্ভুল ॥

ঋণ সীমাহীন

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

ও আকাশকুসুম কুঞ্জে তন্দ্রালীন নয়—
কিংবা নয় সুগন্ধি প্রান্তরের উন্মীল স্বপ্নে মগ্ন!
শুধু ওর সংগ্রাম-উদ্দীপ্ত দুটি দ্যুতিময় চোখ
দুর্নিবার ধমনীর শোণিতে ও ঘামে
যে-ছবি এঁকেছে জীবনের সুদৃপ্ত পটে—
তা বাস্তবের প্রদাহে প্রোজ্জ্বল,
হৃদয়ের দাবদাহে অনন্য!

আমাকে ও অনুপ্রাণিত করে প্রতিদিন
এই মুমূর্ষু দ্বীপের এককোণে—
তাই—
আমার উপোসী ও অক্লান্ত পৃথিবী
আজো সিন্ধুসমুদ্রে দাঁড় টানে।

আরও মানি—
ওর দুটি সংগ্রামী হাতছানি আমাকে বাঁচায়
অধুনা-মদির মদক্ষিপ্ত বিলাসের চূড়ান্ত উল্লাসের
রক্তিম হত্যার হাত থেকে।

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

সুধীর চক্রবর্তী

[চতুর্থ কিস্তি]

১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের কোনো সভা-সমাবেশে সে দেশের তৎকালীন শ্রম ও শিল্প-কল্যাণ মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন লালন শাহ একজন উঁচুদরের সুফী সাধক ছিলেন এবং পবিত্র কোরানের ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। কাগজে এ-মন্তব্য পড়ে কুষ্টিয়ার নিষ্ঠাবান মুসলমান পণ্ডিত এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দীন উৎকণ্ঠিতপ্রতিবাদ ছাপেন[১] এই ভাষায় যে,

> ভি. আই. পি-দের বাণী সাধারণ মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে; তাই তাদেরকে বিশেষ ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়। আমাদের মাননীয় শ্রমকল্যাণ মন্ত্রী সাহেব লালন সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তা মুসলমান সমাজের রাষ্ট্রপরিচালক ও ভি. আই. পি-দের নিকট হতে এ প্রকারের কোন বক্তব্য প্রকাশ না হয় দেশবাসী তাই কামনা করে।
>
> মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার কিছু বলবার আছে। লালনকে সাধক বলতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু সুফী সাধক তায় আবার উঁচুদরের সাধক ছিলেন একথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না।

চিঠির বাকি অংশে ইমামউদ্দীন পাঁচটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের অসারতা এবং মন্তব্য করেছেন 'লালনকে উঁচুদরের সাধক ত' দূরের কথা মুসলমানও বলা যায় না।'

এর আগে, ১৯৬৯ সালে, "বাউল মতবাদ ও ইসলাম" বইতে ইমামউদ্দীন খারিজ করেছিলেন জেড. এ. তোফায়েল এবং আনোয়ারুল করীমের বক্তব্য। তোফায়েল তাঁর "History of Kustiya" বইতে লালন ফকির সম্পর্কে বলেছিলেন, 'He was greatly influenced by the best tenets of Sufism and Vaishnabism, which en-

riched Baulism'। আনোয়ারুল করীম তাঁর "বাউল কবি লালনশাহ" বইতে লিখেছিলেন, 'লালন ফকিরের গানে যেমন আমরা ইসলাম ও নবী-প্রীতির পরিচয় পাই, তেমনি বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়ার সাধনমার্গের কথাও শুনতে পাই।...লালন ফকিরের সাধনায় দুই ধর্মেরই যোগ ছিল।' দুজনেরই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ইমামউদ্দীন লেখেন, 'কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মুসলমান কখনই দুই নৌকার যাত্রী হইতে পারেন না। মুসলমান শুধু মুসলমানই, অন্য কিছু নহেন। দুধও খাব তামাকও খাব এ নীতি ইসলামে অচল।'

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। মধ্যযুগে এদেশে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিসমন্বয়ের বহুতর প্রয়াসের চিহ্ন বাঙলা সাহিত্যে রয়ে গেছে। ধর্মসমন্বয় থেকেই সেই সংস্কৃতিসমন্বয়ের সূচনা ঘটে।

আসলে মধ্যযুগের বাঙলায় বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতির নানারকম গূঢ় বিমিশ্রণ ঘটেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। ধর্মের নির্দেশ বা শাস্ত্র-ধারণা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো খুব বিচারশীল বা নিষ্ঠাশীল হয় না। তারা শাস্ত্রবিশ্বাস আর আচরণবাদকে বড়ো করে না দেখে ভাবালুতা ও আবেগকে বড়ো ভাবে। এরাই একসময়ে সত্য-নারায়ণের সঙ্গে পিরবাদকে মিশিয়ে সত্যপির দেবতার কল্পনা করেছিল, যেখানে হিন্দু-মুসলমান ভক্তের ভেদবাদ ছিল না, আজও নেই। অতি সম্প্রতি বীরভূমের দুবরাজপুরের কাছে দায়েমশাহ ফকিরডাঙা বলে একটা গ্রামের মধ্যে দায়েমশার মাজারে তালেব শাহ ফকিরের কণ্ঠে এক অপরূপ সমন্বয়বাদী গান শুনলাম। অশিক্ষিত পল্লীগায়ক সারিন্দা বাজিয়ে গাইলেন,

মরুতে এলেন মোহম্মদ
মথুরাতে গেলেন শ্যাম—
ইমান খেলা খেলেন রসুল
লীলা খেলেন ঘনশ্যাম।
মা এইসা পাগল হলেন
নবীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশির সুরে পাগল হয়ে
রাধা চলে যমুনায়
একই মায়ের দুটি সন্তান
হিন্দু আর মুসলমান
একই কুলে জন্ম মোদের
একই বুকে দুগ্ধপান।
দেখে আয় ভাই হিন্দু মুসলিম
মদিনা আর মথুরায়
দুই রাখালে যুক্তি ক'রে
গরু আর বকরি চরায়।

এমন সহজ সমন্বয়বোধের গান আমাদের জাতিসম্পদ কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা এমন স্বচ্ছ জীবনস্পর্শী গানে যদি খুঁজে পান ইসলামের ব্যর্থতা আর পতনের চিহ্ন, তবে খেদ হয়। কথাটা উঠল এইজন্য যে, ১৯৬৫ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র লেখা "মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" বইতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদের সাহিত্যকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি উদ্‌ধৃতি দিচ্ছি :

> মুছলমান নবাব বাদশাহগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং হিন্দু কবি, সাহিত্যিক ও ধর্মপুরোহিতগণের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে পৌত্তলিকতাপূর্ণ আবহাওয়া এখানে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে বাংলার মুছলমানগণ হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট ও বিশ্বাসী হইয়া উঠিতে থাকেন।...আমাদের দুঃখের পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া তোলার জন্যই যেন এই সময়কার মুছলিম কবিসাহিত্যিকগণের প্রায় সকলেই দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিগণকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের দেবদেবীর স্মৃতি-মূলক পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ও যৌন আবেদনমূলক কীর্তন, মনসার ভাসান সঙ্গীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র এবং হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বহু পুঁথিপুস্তক রচনা করেন।[২] আকরম খাঁর ধারণা, ব্রাহ্মণের অত্যাচারে বিপন্ন বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। একই কারণে হিন্দুরা নেন ইসলামের ছায়াতল। এটা প্রথম যুগ।

দ্বিতীয় যুগে মুছলিম জনসাধারণ বিশেষ করিয়া তাহাদের মধ্যবিত্তশ্রেণী এরূপ এক কলুষিত এছলাম-বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করিতেছিল যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে ধর্মান্তরিত এই সমস্ত নও মুছলমানদের পক্ষে এছলামের সত্যকার শিক্ষা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং কোন সময়ে সরাসরিভাবে এবং কোন সময়ে আরবী ফারসী নামের আবরণে তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী এবং কুসংস্কার সমূহকেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পায় এবং এই সমস্তই পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ...মুছলিম বাংলার পতন যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে কালা (কালী?) ও গঙ্গার স্তোত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন এরূপ বহু সৈয়দ, মীরজা ও পাঠান কবির সাক্ষাৎ আমরা পাইব। আকবর কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে স্থানান্তরিত একদল ধর্মদ্রোহী পীর ও ফকিরের আগমনের ফলে এই সময় অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।[৩]

বাস্তবিক দেখবার চোখের কতখানি তফাত থাকলে ভেদবাদ এসে যায় আকরম খাঁর বই তার এক বেদনাময় দৃষ্টান্ত। এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতো জহুরি সমালোচক যখন মোহাম্মদ আকবরের (জন্ম ১৬৫৭) পুঁথিকাব্যের সমন্বয়বাদ লক্ষ করে 'চমৎকার ও উপভোগ্য' বলে তারিফ করেছেন, তখন আকরম খাঁ-র মনে হয়েছে ওই রচনায় 'আলোচ্য সময়ে মুছলিম বাংলা অধঃপতনের কোন্ অতল গহ্বরে নামিয়া গিয়াছিল এবং মুছলিম ধর্মবিশ্বাসে কিরূপ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ...কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, বর্তমান সময়ের দুইজন অতি উচ্চশিক্ষিত মুছলমান এই বন্দনা গীতিটিকে উপভোগ্য বলিয়া ইহার প্রশংসা কীর্তন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। মুছলিম বঙ্গের ধর্মীয় ও তামদ্দুনিক অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত নজীর আর কি দেওয়া যাইতে পারে!'

ভ্রান্তমতি আকরম খাঁ বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতির দেওয়া-নেওয়ার পারস্পরিক ধরনটি বুঝতে পারেন নি বলে তাঁর বইতে অনেক অপসিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, মধ্যযুগের মুসলমান কবিরা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আদর্শরূপে নেওয়ার ফলে কেবল তা সাহিত্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং

> মুছলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে ইহা সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুণ—পীর বদরে, গৌরচন্দ্র চৈতন্য—গোরাচাঁদ পীরে, ওলাইচণ্ডী—ওলা বিবিতে, সত্যনারায়ণ—সত্যপীরে, লক্ষ্মীদেবী—মা বরকতে রূপান্তরিত হন। ...তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর, বহু কল্পিত পীরের কবর এবং কোন কবরের সহিত সম্পর্করহিত বহু কল্পিত পীরও মুছলমানদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, সিন্নি ও মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করিতে থাকেন। অনেক থান, খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুছলমানদের সুখসমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের আল্লাহর স্থান দখল করিয়া থাকে।[৪]

আকরম খাঁ-র বই একদিক থেকে খুব দ্যোতক। সহজ স্বাভাবিক তথ্যপূর্ণ ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রবণতা কতটা মারাত্মক হতে পারে আকরমের ইতিহাসদৃষ্টি

তার এক করুণ দৃষ্টান্ত। শ্রীচৈতন্যকে তিনি হোসেন শাহের রাজকোষের অর্থ-অপহরণকারী বলেছেন। 'ছোলতান হোছেনের প্রাথমিক দোষদুর্বলতার সুযোগ' নিয়ে গৌড়রাজ্যের 'সাধুসন্ন্যাসী রূপধারী বৈষ্ণব জনতা' বাঙলাদেশ থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম শাসনকে সমূলে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সুলতান ও স্থানীয় মুসলিম নেতাদের সতর্কতায় তা ঘটে নি, আকরম খাঁ এমত মন্তব্য ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন 'এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ' হয়েই চৈতন্য বিদেশযাত্রা করেন। চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্ম সম্পর্কে খাঁ সাহেবের মতামত হল :

> পুরাতন বৈষ্ণব ধর্মকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা পাইয়া শ্রীচৈতন্য যে ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে তাহাতে হিন্দু-জাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং আংশিকভাবে হইলেও মোছলেম সমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

এসব ভ্রান্তবাদী দৃষ্টিকোণ এবং মন্তব্য পড়ে ভাবার কারণ নেই যে, সব মুসলমান লেখক এমনতর কট্টর ধর্মপ্রেমী। উদার মানসতা এবং স্বাভাবিক ইতিহাসবোধ মুসলিম চেতনায় অলক্ষ নয়। যেমন বাংলাদেশের অধ্যাপক আহমদ শরীফ। তাঁর মনে হয়েছে বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের কালে দুটি আলাদা পথে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে যাঁরা বামাচারী ছিলেন না তাঁরা হয়েছিলেন শৈব নাথযোগী, আর যাঁরা বামাচারী তাঁরা হয়েছিলেন বৈষ্ণব সহজিয়া। এই পর্যন্ত বলে শরীফ বলেছেন আর-একটু এগিয়ে,

> আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া বা রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই হয়তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে।... এটিরই লোকপ্রচলিত নাম "বাউল সম্প্রদায়"। যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল, আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।[৫]

একেই বলব স্বচ্ছচোখে সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলমান যদি হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতির কথা জানে, বোঝে, ব্যবহার করে সেই রূপক-প্রতীক, তাতে অন্যায়টা কোথায়? তেমনই হিন্দু লোকগীতিকারের রচনায় যখন পাই ইসলাম ধর্মের স্বাভাবিক উল্লেখ এবং ইসলামি শাস্ত্রসম্পর্কে সচেতনতা, তখনই বা আশ্চর্যের কী আছে? বাউল মতবাদ তো বিমিশ্রণধর্মী। তাই পরমতসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িকতাহীন এই লোকধর্ম বহু বছর আমাদের নিম্নবর্গের সমাজস্তরে একটি স্বস্তিকর মিলনভূমি রচনা করেছে। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-জাতিহীন মানুষ তাদের উপাস্য। তাদের আবির্ভাব ও বিকাশে বৈষ্ণব ও সুফি প্রভাব অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু বাউলদের বিপুল জনগ্রহণীয়তা এবং সংখ্যা-বৃদ্ধি বিশ শতকে অনেকের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। লালনের তিরোধানের পর এদেশে ষাট-সত্তর লক্ষ বাউল ছিল, এমন বিবরণ পাওয়া যায়। লালনের জীবনধারা ও গানের মর্মবাণী বহু হিন্দু-মুসলমানকে বাউলপন্থায় আকৃষ্ট করেছিল। সেটা কট্টর মোল্লা-মৌলভীদের ভালো লাগার কথা নয়। "বাউল ধ্বংস ফৎওয়া" বই থেকে দেখা যায় নদীয়া, পাবনা, যশোহর, রংপুর, বরিশাল, মুরশিদাবাদের ১৭৪ জন আলেম মুসলমান, বাউলদের সম্পর্কে তাঁদের ইতিকর্তব্য জানতে চেয়েছেন। তার জবাবে ফৎওয়াতে মৌলবী রেয়াজুদ্দিন জানিয়েছেন : 'কোন মোছলমান পবিত্র এছলাম পরিত্যাগ করিলে (অর্থাৎ এছলাম হইতে বিমুখ হইলে) পবিত্র শরীয়তে তাহাকে "মোরতেদ, কাফের" বলে। অতএব বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণের আকিদা, বিশ্বাস, উক্তি বা কার্য-কলাপাদি...তদ্বারা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারা পবিত্র এছলামকে ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা মোরতেদ কাফের।'

"বাউল ধ্বংস ফৎওয়া"-তে হাজী মৌলভী রেয়াজউদ্দিন আহমদ উল্লেখ করেছেন যে বাউলদের দ্বারা 'মোছলমান সমাজের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই' কিন্তু এমন বাস্তব বিষয়টি জগৎকে দেখিয়ে মুসলমান সমাজকে বাঁচাবার উপায় নির্ধারণ করা তিনটি কারণে কঠিন। এক, বাউলদের মারফতি সাধনা এত গোপন যে সর্বসাধারণ তা জানতে পারে না। দুই, বাউলদের আচরণ এত ঘৃণাযোগ্য ও অকথ্য যে সভ্য সমাজকে তা বিশ্বাস করানো কঠিন। তিন, ইংরাজ আইনের বিধানে যে কেউ যা কিছু করতে পারে, তাতে বাধা দিলে ফৌজদারি আইনে অভিযুক্ত হতে হয়। এর বাইরে আরেকটা সামাজিক সমস্যা হল,

> জগতে এছলামের যতপ্রকার শত্রুই থাক না কেন সকলেই ইহাদের [বাউল ফকিরদের] নিকট পরাস্ত কারণ ইহারা ভিতরে অমোছলমান, বাহিরে মোছলমানী নামে নাম, মোছলমান মহল্যায় বাস, মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহসাদী ও মোছলমানের সকলপ্রকার সামাজিকতায় ভুক্ত। এই অপরিচিত অপ্রকাশ্যভাবে ইহাদের মোছলমানের সহিত মেলামেশার ফলে দলে-দলে অশিক্ষিত মোছলমান ইহাদের ধোকাবাজী বুঝিতে না পারিয়া সনাতন এছলাম ধর্মকে ও পবিত্র কোরানকে ত্যাগ করতঃ কাফের মোরতেদ হইয়া যাইতেছে।[৬]

১৯২৫ সাল বরাবর ইসলাম সমাজের বিপন্নতার এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে সেসময়ে বাউলদের কোনো-ভাবেই মুসলমানসমাজভুক্ত ভাবা হয় নি, বরং ভাবা হয়েছে ভ্রষ্ট, পতিত কাফের। কিন্তু হঠাৎ পাকিস্তান আমলে বাউলশ্রেষ্ঠ লালন ফকিরকে মুসলমানবংশ-জাত প্রমাণ করার ধুম পড়ে যায়। পরে, সেই প্রয়াসের সম্প্রসারণে তাঁকে সুফি সাধক এবং তাঁর গানকে সুফি "সামা" গানরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কিঞ্চিৎ স্ববিরোধী, এমনকী কৌতুকাবহ।

মুহম্মদ আবু তালিব "লালন চরিতের উপাদান : তথ্য ও সত্য" নিবন্ধে "চিশতী-নিযামী তরীকার শিজরানামা"*-র অন্তর্গত করেছেন লালনশাহী ধারাকে এবং কৌশলে লালনকে হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সুফি খানদানের অংশভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত, তাঁর কিছু মন্তব্য ও মতামত বেশ সুকৌশল বিন্যাসে তালিব সাহেব ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন :

> সুফী সম্প্রদায়ের লোকই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত-সম্প্রদায় গঠন করেছে এবং বিধর্মী নামে চিহ্নিত হলেও সকল ধর্মাবলম্বী সঙ্গীত পাগল সম্প্রদায় একত্র হয়ে যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ সঙ্গীত-ঘরানার জন্ম দিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে লালনশাহ ফকীরকে কেন্দ্র করে এমনি একটি সঙ্গীত ঘরানার জন্ম হয়েছে। একে সাধারণভাবে "বাউল" নামে অভিহিত করা হলেও বিশেষভাবে একে "লালন-শাহী ঘরানা" বলা যুক্তিযুক্ত এই কারণে যে, এটি মূলত লালনশাহ ও তাঁর সাঙ্গীতিক আদর্শে অনুরঞ্জিত। যে আদর্শ ইসলামী সুফী জীবনাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এটি বিখ্যাত চিশতিয়া তরীকার নিযামীয়া শাখার উত্তরাধিকার।[৭]

কী অদ্ভুত স্বেচ্ছাচারী মন্তব্য! যেন তালিব সাহেবের এক কলমের খোঁচায় বাঙলা গানের প্রবহমান লোকায়ত গানের ঐতিহ্য খারিজ হয়ে যাবে। কী স্পর্ধা! লালন-শাহী ঘরানা কি সুরের বা বন্দিশের নাকি ভাবের?

* শিজরানামার অর্থ গুরু-শিষ্য (পীর/মুরিদ) পরম্পরার তালিকা।

যদি সুর বা বন্দিশের হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে বাঙলা গানের ধারায় লালনের গান কি কোনো স্পষ্ট ও পৃথক ঘরানার সৃষ্টি করতে পেরেছে? সুর নয়, লালনগীতি কি তার ভাবমূল্য ও বস্তুসত্যেই কালজয়ী হয় নি? তবে ঘরানার প্রশ্ন ওঠে কী করে?

আসলে তালিবের অভিসন্ধি অনেক গভীরে। তাঁর লক্ষ্য লালনকে সুফি ধারার মুসলমান সাধকরূপে প্রতিষ্ঠা করা। তবে তালিব খেয়াল করেন নি যে তাঁর প্রয়াস খুব নতুন নয়। এককালে বাউলরা নিজেরাই সম্ভবত মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করবার জন্য নিজেদের সুফি খানদানের সিজরানামাভুক্ত করে একটা সামাজিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। ফৎওয়া-বইতে এমনতর প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে বলা হয়েছে:

> বাউল ন্যাড়া ফকিরগণ, কাদেরিয়া সহরওয়ারদিয়া, নক্‌শ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দাদিয়া ও চিস্তিয়া খান্দানের দাবী করিয়া মোছলমানকে ধোকায় ফেলিয়া দেয়।...কোন্ মুখে বাউল ন্যাড়াগণ কোরআন হাদিছ ও জাহেরী এলেম ও আলেম ও পবিত্র শরীয়াতের উচ্ছেদ দিয়া আপন স্বেচ্ছাচারীতায় জঘন্য কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ করতঃ চিস্তিয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি খান্দানের দরবেশ ফকির বলিয়া পরিচয় দিয়া মূর্খ মোছলমানকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া তাহাদের ন্যায় কাফের জাহান্নামী করিয়া তোলে। প্রত্যেক মোছলমানের উচিত যে উপরোক্ত খান্দানের ফকিরগণের সেজরার বাউল ন্যাড়াদলের ফকিরীর মাপকাটিতে ওজন করিয়া তাহাদের হাত হইতে লোককে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন।[৮]

তাহলে দেখা গেল, ত্রিশের দশকের মৌলভী ও মোল্লারা যে ব্যাপারে নৈষ্ঠিক মুসলমানদের সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছেন, আবু তালিব ষাট-সত্তর দশকে সেই নিন্দনীয় কাজটি করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছেন। তিনি লালনকে বাউল বলে সম্মান না দেখিয়ে, তাঁকে সুফি খানদানের অংশভাক্ করে তবে সম্মান করছেন। লালনের সুফিত্বের কোনো প্রমাণ মেলে নি যদিও।

লালন ফকির সদর্থে সুফিও নন, মুসলমান নন, হয়তো সে-অর্থে যথার্থ বাউলও নন, কেননা সারা দেশের বাউল ধারণার সঙ্গে লালন মতের কিছু-কিছু মিল থাকলেও লালনীয় মতবাদ একটু আলাদা পথচারী। সে আলোচনা পরে আসবে। তবে লালনপরবর্তী মৌলানা-মৌলভী এবং নৈষ্ঠিক হিন্দুবর্গ তাঁকে বাউলশ্রেণীভুক্ত করেছেন। তার একটা বড়ো কারণ হল, সারা দেশের বাউল-ফকিররা লালনের গান সবচেয়ে বেশি গেয়ে থাকেন এবং তাঁর গানে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করবার মতো অনেক যুক্তি ও তত্ত্বের ভিত্তি খুঁজে পান। খুব নির্মোহ ইতিহাসের বিচারে লালনের কোনো গুরুপরম্পরা পাওয়া যায় না। সিরাজ সাঁই তাঁর কায়কর্মের দীক্ষা- ও শিক্ষা-গুরু বড়ো জোর। সেই দেহতত্ত্বের চিরায়ত পথে লালন নিজস্ব একক সাধনা ও উপলব্ধি নিয়ে এগিয়েছেন। যত এগিয়েছেন তত নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন। ক্রমেই খসে পড়েছে প্রচলিত ধর্ম-আচার-মন্ত্র-শাস্ত্র আর প্রতিষ্ঠানের বর্ম। ছেঁউড়িয়ায় নির্জন নিম্নবর্গের জনসমাজে স্বনিবাসী মানুষটি আপন অন্তরের অনুজ্ঞা মেনে আপনমনের একতারাতে গান বেঁধেছেন। গানই তাঁর জীবনসত্য ও জীবনচেতনার ক্রম-অভিব্যক্তির ক্রমাগ্রসর নজির। আজ এতদিন পরে সেসব গান কালানুক্রমিকভাবে সাজানো যাবে না। সাজানো গেলে, রবীন্দ্রনাথের রচনার মতোই একজন স্রষ্টার ক্রমিক উত্তরণের পথ আমরা চিহ্নিত করতে পারতাম। প্রকৃত অর্থে তাঁর কোনো মন্ত্রশিষ্য সম্ভবত ছিলেন না, ছিলেন বহুতর অনুগামী এবং গায়ক। তাঁদের ধারণা আর বোধবুদ্ধি লালনের মতো প্রখর ও দ্যুতিমান ছিল না। গুরুর রেখে-যাওয়া অমূল্য গানের পরম্পরা তাঁরা বিন্যাস করে, পর্বে-পর্বে বুঝে গাইতে এবং প্রচার করতে পারেন নি। হয়তো ব্যক্তি ও সাধক লালন তাঁদের যতটা আচ্ছন্ন করেছিল,

লালনের গানের অন্তঃশীল বাণীময়তা তাঁদের বোধে তেমন রেশ তোলে নি। আর-পাঁচটা লোকায়ত গানের ধারায় লালনগীতির বিচার করা তাই ঠিক হবে কি? গানে-গানে তো বন্ধন ঘুচে গেছে তাঁর। সুরদাস, কবীর, নানক, দাদূ বা মীরার মতো লালনের গান কেবলই আত্ম-আস্বাদন ও আত্ম-উৎসারণ। কোনো সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধির অশুভ প্রবর্তনা, কোনো আচরণবাদীর শুদ্ধতার ভান সে-গানের কাছে যেতে পারে না।

কিন্তু লালন কেন গান লিখলেন সে প্রশ্ন ওঠে। একটা কারণ বাঙালি স্বভাবত গানরচনায় পটু। লালনের অভিজ্ঞতাতে পদাবলী কীর্তন, শাক্ত গান, কবি ও পাঁচালি গানের শ্রুতিবাহিত ঐতিহ্য ছিল। এক ধরনের লোকজ গান (ফকিরি বা মুর্শিদা) তাঁর সমসময়ে নদীয়া-যশোহর-পাবনায় চালু ছিল। দেখা যাবে, লালনগীতির নির্মাণে কোনো স্বতন্ত্র সাংগীতিক মেধা বা মনন নেই, কারণ লালন ঠিক সংগীতকার ছিলেন না। প্রচলিত ঠাটের ধুয়ো এবং তিনটি বা চারটি একই সুরকাঠামোর অন্তরা লালনগীতিতে আছে। তার মানে গানের গাঠনিক কোনো মৌলিকতার প্রয়াস না নিয়ে লালন তাঁর গানকে সমৃদ্ধ করেছেন ভাবসত্যে, তির্যক বক্তব্যে এবং শব্দ-ব্যবহারের দ্যোতনাবহুল দীপ্র কুশলতায়। যেমন তাঁর ভাবনা, তেমনই তাঁর প্রকাশভঙ্গি ছিল সে যুগের পক্ষে ঝকঝকে, চমকপ্রদ।

কিন্তু তাঁর গানের ভুবন দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত ছিল। সমাজের যে-বর্গে লোকায়ত গায়কদের চলাফেরা সেখানে সমঝদারি কম। সাধারণ মুমুক্ষু মানুষ বৈরাগ্যের গান ভালোবাসে। ইহজীবনের বিফলতা এবং দেহজীবনের মরিযুতা তাদের ভাবায়। লালনের নিগূঢ় উচ্চারণ বা শব্দবন্ধের চকিত ব্যবহার গড়পড়তা গায়ক ও শ্রোতার তাই অনুধাবন করবার কথা নয়। "শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে", "আমার ঘরের চাবি পরের হাতে", "যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে"-জাতীয় উজ্জ্বল এপিগ্রামের গভীরতা তাঁর সমসময়ে কজনই বা বুঝেছিল? মুহম্মদ আবদুল হাই সঠিক বলেছেন যে,[৯]

> লালন শাহের নাম কেউ জানতোই না, আর তিনি তো বেসরা ফকির ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় লিখতেন। এজন্য আরবী শিক্ষিত ও ইংরেজী শিক্ষিত মহল তাঁর দিকে নজর দেন নি। আমাদের দেশের প্রাণশক্তিকে ভদ্রলোকেরা চিরকালই উপেক্ষা করেছে।
>
> লালন শাহ দরিদ্র ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান তাঁতীদের দ্বারা লালিত পালিত এবং সংরক্ষিত হন। লালন শাহের কথা শিক্ষিত মহল তখন গ্রাহ্যই করে নি, আদৌ মনোযোগ দেয় নি।
>
> লালন শাহের গানের মধ্যে জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায় এবং গানগুলো আনন্দদায়ক।... প্রকৃতপক্ষে লালন শাহ অশিক্ষিত হলেও তাঁর গান জ্যোতির্ময়। দাশরথি রায় ও মধু কান এমনকি রামপ্রসাদের ভাষা হতেও উচ্চতর ও অধিকতর ব্যঞ্জনাময়। তৎকালীন কোন মুসলমান লেখকের কেহই লালন শাহের রচনাশৈলীর কাছে পৌঁছুতে পারে নাই।
>
> লালন শাহ মরমীয় লোককবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য। এত চমৎকার ভাষা লালন শাহ ব্যবহার করেছেন যে কোন মুসলমান কবির রচনা তাঁর গানের সামনে দাঁড়াতে পারে না।

মুহম্মদ হাই তার নিজস্ব ঢঙে লালনের যে মূল্য নির্ধারণ করেছেন তাতে সকলেই সায় দেবেন সম্ভবত। যদিও মুসলমান লেখকদের সঙ্গে বা পরিপ্রেক্ষিতে লালনের প্রসঙ্গ টেনে আনা কেমন যেন হীনম্মন্যতার বোধে আচ্ছন্ন। লালনের রচনা স্বয়ম্ভর ও স্বমহিম। মুসলমান রচয়িতা হিসাবে তাঁকে বিচার করা এক-রকমের ভ্রান্তি। দাশরথি বা মধু কানের চেয়ে তিনি মহত্তর নিশ্চয়ই, তবে সমসাময়িক প্রচার-প্রসার-জনাদর যা অন্য দুজন পেয়ে গেছেন তার এক-দশমাংশও

লালন জীবিতকালে পান নি। রামপ্রসাদের চেয়ে তাঁকে উচ্চস্তরের যদি বলতে হয় তবে সেটাও বিপুল জনগ্রহণীয়তার প্রশ্নে নয়—আধুনিকতায়, মানবিক-বোধে ও প্রকাশভঙ্গির দৃঢ়তায়। লালনের গানে রবীন্দ্রনাথ সেটাই দেখেছিলেন। লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ এমনকি গগন হরকরার দুটি গানের সুরে নিজের গান বেঁধেছিলেন কিন্তু লালনগীতির সুরে প্রভাবিত হন নি। কেননা থিমেটিক দিক থেকে তাঁর লালনের গান ভালো লেগেছিল। ভালোবেসেছিলেন তার অন্তর্বাণীর লাবণ্য, তার স্পন্দমান ভারতীয়তা।

লালনপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উঠে আসা স্বাভাবিক, কেননা তিনিই প্রকৃত অর্থে ভদ্রসমাজে ছাপার অক্ষরে লালনের গান হাজির করেন, সংগ্রহ করেন তাঁর গান, বক্তৃতা দিয়ে বিশ্লেষণ করেন লালনগীতির মৌলিক-স্বভাব। তবে একটা কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ লালন বা বাউলদের নিয়ে যেমন মেতেছিলেন পরবর্তী কালে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। যদিও রবীন্দ্রনাথের নানা গানে বাউল গানের অন্তঃস্পন্দ শোনা যায়, তবু কোনো কারণে বাউলদের সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। তার একটা নমুনা এই দেখি যে, শান্তিনিকেতনের এত কাছে জয়দেব কেঁদুলি বা বহুতর বাউলসত্র অথচ রবীন্দ্রনাথ বীরভূমের বাউলদের সম্পর্কে সক্রিয় উৎসাহ বা তাঁদের গান সংগ্রহে উদ্যোগ নেন নি। মনে হয়, বাউলদের "মনের মানুষ" তত্ত্বের ভাবালুতা তাঁকে এককালে যতটা উদ্বোধিত করেছিল তাদের জীবন-যাপনের মুক্ত ধরন, বস্তুবাদ ও তর্কমুখী তাত্ত্বিকতা তাঁকে ততটা টানে নি। সবদিক বিচার করে লক্ষ করা যায়, বাউলজীবন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এক রোমানটিক সংবেদনে মধুর ও আনন্দদায়ক। শেষজীবনে (বৈশাখ ১৩৪৩) বাউলজীবন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন যা বহু উদ্ধৃত, তবু পুনরুদ্ধৃতির লোভ সামলানো কঠিন :

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

কবিতাটির কোথাও বাউল সম্প্রদায়ের কথা স্পষ্টভাবে নেই কিন্তু বর্ণনার দ্যোতনা থেকে তাদের চিনে নেওয়া খুব কঠিন নয়। তবে বাউলদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা একটু অন্যভাবে ফুটে উঠেছে এখানে, যা বিতর্কযোগ্য। কেননা বাউলরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় না, তারা মানবতাবাদী। তাদের বক্তব্য অনেকটা ধরা পড়েছে কুবির গোঁসাইয়ের গানে :

মানুষ হয়ে মানুষ মানো
মানুষ হয়ে মানুষ জানো
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতনধন।
করো সেই মানুষের অন্বেষণ॥

পদ্মানদী যেমন পাকা দেউলের পুরানো ভিত ভেঙে দিতে দ্বিধা করে না, বাউল কি তেমন? সে কি কিছু পুরানো ভিত ভাঙতে চেয়েছে না শাস্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে? বাউল মতবাদ আসলে একটা parallel tradition। নতুন যুক্তিকাঠামো দিয়ে তারা চায় নতুন জীবনবোধ গড়তে। তবে এটা ঠিক

যে, তাদের সাধনার পথ নিঃসঙ্গ নির্জন এবং অবশ্যই গভীর চলার গোপনতায় অন্তর্গূঢ়। সমাজপতিদের আর ধর্মধ্বজীদের কোনো ধিক্কার ও দ্রোহ তাদের সেই গুহ্যসাধনার আততি থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে না। গানের ধারা বেয়েই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চলাফেরা। কিন্তু গান কেন? জবাবটা রবীন্দ্রনাথের জবানিতে শোনা যাক :

শাস্ত্রের যে-ভগবান ধর্মকর্মের ব্যবহারে লাগেন, যিনি সনাতনপন্থী ধার্মিক লোকের ভগবান, তাঁকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক শ্লোক চলে; তাঁর জন্যে অনেক মন্ত্রতন্ত্র; আর যে-ভগবানকে নিজের আত্মার মধ্যে ভক্ত সত্য করে দেখেছেন, যিনি অহৈতুক আনন্দের ভগবান, তাঁকে নিয়েই গান গাওয়া যায়।

অবশ্য তবু প্রশ্ন থাকে। বাউলের "মনের মানুষ" তো ভগবান নয়। অহৈতুক আনন্দের ভগবানকে কোনো বর্গের কায়াবাদী লোকধর্ম খোঁজে না। তাদের কথা :

এই দেহ মিথ্যে নয় মন
এই দেহেই আছে আছে রতন।
যে খোঁজে পায় অন্বেষণ
জীয়ন্তে মরে আপন ইচ্ছায়।

লালনের গানের অভিপ্রায় আর রবীন্দ্রনাথের আস্বাদনের মাঝে আসলে লক্ষ যোজন ব্যবধান।

শুধু বাউল নয়, বাঙলার অনেকগুলি লোকধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের পূর্বাচার্য এবং অগ্রণী গবেষকরা কিছু ভাবালুতাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন কিংবা ঘৃণার ধিক্কারের। যেমন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" (১৮৬৮) বইতে বাউলদের সম্পর্কে লিখে গেছেন : 'এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নরবধ করে না সত্য কিন্তু নর-দেহ পাইলে তাহার মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ পূর্বক পরিধান প্রথাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।' পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর "Hindu Castes and Sects" (১৮৯৬) বইতে লিখেছেন : 'Baul—a mad man. A class of beggars who pretend to be mad on account of religious fervour, and try to uphold their pretension by their fantastic dress, dirty habits, and the queer philosophy of their songs. The Bauls are low class men, and make it a point to appear as dirty as possible.'

এইসব শেষ উনিশ-শতকীয় অত্যাশ্চর্য বিবরণের সঙ্গে ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রকবিতার বর্ণিত গানের ধারা বেয়ে একতারা হাতে গভীর নির্জন পথের অন্বেষী বাউলের কোনো মিল নেই। আমাদের দেশে বাউল-জীবন কেমন করে ঘৃণা থেকে বিনোদনে, ধিক্কার থেকে ভারত-উৎসবে রপ্তানি দ্রব্য হয়ে উঠেছে, তার এক সামাজিক ইতিহাস লেখা যায়। ভদ্রশ্রেণীর মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান লেখক লোকায়ত সাধকদের তাঁদের মর্জিমত কখনও অবমানিত করেছেন, কখনও রোমানটিক মনোভাব নিয়ে মাথায় তুলেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের ধর্মমত বিষয়ে ১৯০৯ সালের ভাষণে বলেছিলেন এক অলীক অনুমানের কথা। লালন নাকি 'মুসলমান জৈন-মত সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার' করেছেন যাতে চিন্তা করবার অনেক বিষয় আছে। এমন সব বিচ্ছিন্ন পরস্পরবিরোধী মতামত থেকে আজ বোঝা যায়, প্রকৃত সহানুভূতি নিয়ে সরেজমিন সংযোগ স্থাপন করে লালনপন্থা তথা বাউলদের বোঝবার চেষ্টা ক্রমে-ক্রমে গড়ে উঠেছে। এই বোঝবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম করেছেন এবং তাঁর প্রবর্তনায় ক্ষিতিমোহন সেন। পরে বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মতিলাল দাস ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সারা বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও মুসলমান আলেম সমাজের দ্বারা ধিক্কৃত ও নিন্দিত মারফতি বাউলদের সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি এবং

উদার সমাধানের পথ বাতলানোর মতো মুক্তবুদ্ধির কিছু মানুষকেও আমরা পেয়েছি। যেমন কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯২৭ সালে ফরিদপুরে মুসলিম ছাত্রসমিতির বার্ষিক অধিবেশনে ওদুদ বলেছিলেন:

> ইসলাম কিভাবে বাঙালীর জীবনে সার্থকতা লাভ করবে, তার সন্ধান যতটুকু পাওয়া যাবে বাংলার এই মারফৎ-পন্থীর কাছে ততটুকুও পাওয়া যাবে না বাংলার মওলানার কাছে, কেননা, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মারফৎ-পন্থীর ভিতরে রয়েছে কিছু জীবন্ত ধর্ম, সৃষ্টির বেদনা, পরিবর্তনের বুকে সে এক উদ্ভব; আর মওলানা শুধু অনুকারক, অনাস্বাদিত পুঁথির ভাণ্ডারী—সম্পর্কশূন্য ছন্দোহীন তার জীবন।
>
> এই মারফৎ-পন্থীর বিরুদ্ধে আমাদের আলেম-সম্প্রদায় তাঁদের শক্তিপ্রয়োগ করেছেন, আপনারা জানেন। আলেমদের এই শক্তিপ্রয়োগের বিরুদ্ধে কথা বলবার সব চাইতে বড় প্রয়োজন এইখানে যে সাধনার দ্বারা সাধনাকে জয় করবার চেষ্টা তাঁরা করেন নি, তার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে লাঠির জোরে তাঁরা দাবিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ দেশে মারফৎ পন্থীদের পরিবর্তে যদি একটি বৃহত্তর পূর্ণতর সাধনার সঙ্গে বাংলার যোগসাধনের চেষ্টা আমাদের আলেমদের ভিতরে সত্য হতো, তাহলে তাঁদের কাছ থেকে শুধু বাউল ধ্বংস আর নাসারা দলন ফতোয়াই পেতাম না।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অবশ্য কিছু নৈরাশ্যজনক কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

> Aristocratic Brahmanism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity··· But they seem to be considered as too low or incorrigible by even the proselytising religions. If the Chaitanyanite Gossains, Christian, Missionaries or Mohomedan Mullas could reclaim them they would be entitled to the everlasting gratitude of mankind.[১০]

দৃষ্টিভঙ্গির নানা উচ্চাবচ অবস্থান পণ্ডিতদের মন্তব্যে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সংকট যথার্থ এইটা যে, বাউলদের সম্পর্কে প্রকৃত বাস্তব দৃষ্টিকোণ আমাদের তৈরি হয় নি, সেইজন্য লালন-দর্শন ও তাঁর গানের অন্তঃশায়ী মর্মবাণী না-বুঝে আমরা কেবলই মানুষটাকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু নন, মুসলমান নন, সুফিও নন—এই কথাটা বুঝে এবারে বুঝতে হবে চিরায়ত বাউলধারা তাঁর সাধনায় ও মননে এক শমতা আর ব্যক্তিক গভীরতা পেয়েছে। সেই শমতা আর গভীর ব্যক্তি-অনুভূতি রূপ পেয়েছে অসামান্য তাঁর গীত-বাণীতে, যা উচ্চারণে আধুনিক, শব্দ-চিত্রকল্পে রূপময় এবং বিশ্বাসে মানবিক। সেইজন্য তা আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। বাঙলা কবিতার ব্যক্তিক প'রণতির সবচেয়ে সফল উদাহরণ যেমন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, তেমনই বাঙলা বাউলসাধনার ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরম অভিব্যক্তি লালনের গানে। ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে, তার থেকে প্রাণরস নিয়ে, তবু যেমন রবীন্দ্রকবিতা প্রাতিস্বিক—তেমনই চিরায়ত বাউল-পরম্পরা ও কায়াবাদ মেনে, তাকে অতিক্রম করে, লালন স্বয়ম্বশ। এই অর্থেই তাঁর ভাবনার কোনো পূর্বজ মানুষ নেই, এমনকি সিরাজ সাঁইও, এবং তাঁর রচনার কোনো পরম্পরা নেই, বড়ো জোর অনুসরণ আছে। লালনশাহী মতবাদ লালনের একান্তভাবে নিজস্ব অর্জন। সামূহিক বাউলদের মধ্যে তিনি নির্জন একক।

এবারে বলা দরকার যে গড়পড়তা বাউল-কনসেপ্টকে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাউল মতবাদকে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে, তাঁর নিজস্ব কনসেপ্ট গড়ে উঠেছিল। সেই কনসেপ্টকেই বলা চলে লালন-

পন্থা—যা এক স্বতন্ত্র বীক্ষণ। এই বীক্ষণকোণ খুঁজে পেতে তিনি বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদ অবলম্বন করেন নি নিশ্চিত, সুফি মরমিয়া পথ কিছুটা যে হেঁটেছিলেন তা-ও নিশ্চিত, কিন্তু ইসলামকে নেন নি। তার প্রমাণ সবচেয়ে বড়ো করে পাই লালনের দুটি পদাংশে—

> ১. এমন দিন কি হবে রে আর
> খোদা সেই করে গেল
> রসুলরূপে অবতার।
>
> ২. আদমেতে পয়দা করে
> খোদ ছুরাতে পরওয়ার।
> ছুরাত বিনে পয়দা কি সে হইল
> সে কি হঠাৎকার?

প্রথম পদে আল্লার রসুল হজরত মোহাম্মদকে আল্লার অবতার বলা হয়েছে যা স্পষ্টত ইসলামবিরোধী। দ্বিতীয় পদে ইসলামি বিশ্বাসে নিরাকার আল্লাকে সাকার ভাবা হয়েছে। ভাবা হয়েছে, তার কারণ, লালন 'বর্তমান'-বাদী, 'অনুমান'-বাদী নন। তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে স্রষ্টা (নামান্তরে ভগবান) সম্পর্কে ধারণাগঠন থেকে একেকটা ধর্মের চরিত্র গড়ে ওঠে। লালনপন্থা যে সাকারবাদী তারও অনুপুঙ্খ আছে। তিনি সাকারবাদী কিন্তু পৌত্তলিক নন। সেইজন্য লিখেছেন:

> মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
> সে কি অন্য তত্ত্ব মানে?
> মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
> ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
> ভোলে না সে এ সব রূপী
> ও যে মানুষ রতন চেনে॥

মানুষতত্ত্বে আস্থাশীল বলে লালন অনুমানপন্থী নন। অনুমানপন্থীদের মনের কথা ধরা পড়বে আলেপ নামে একজনের দুটি পদাংশে—

> ১. না দেখে রূপ মহম্মদার কি করে ভজি
> কেবল শুনি কর্ণেতে দেখিনি তো চখেতে।
>
> ২. অনুমানে সাধন হবে রে ঠিক
> রূপ দেখে সাধ তাকে তবে ত হইবে রসিক।

আসলে বলা সংগত যে বাউলগান তত্ত্বাশ্রয়ী রচনা। সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও নবীতত্ত্ব—এই ত্রিস্তরে বিন্যস্ত হয়ে আছে তাদের বিশ্বাসের জগৎ। এ সবেরই দিশারি হলেন গুরু। এইদিক থেকে সুফিদের পীর-মুর্শিদ যেমন বাউলদের সাঁই-গুরু তেমনই। কিন্তু সুফি সাধনায় নারীসঙ্গিনী দরকার হয় না। আল্লার নাম উচ্চারণ করতে-করতে নিজেকে "ফানা" পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই সুফিদের লক্ষ্য। কিন্তু বাউল সাধনা কায়াবাদী। শুধু নিজের দেহ নয়, নারীসঙ্গিনীর দেহ সেখানে আশ্রয়। ইসলামের সঙ্গে লালনপন্থার পার্থক্য অনেক সুনির্দিষ্ট। সে-পার্থক্য বোঝার আগে, মনে রাখা দরকার 'তান্ত্রিক সহজিয়া এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছ হইতে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত তত্ত্ব-বস্তুর সঙ্গে সুফী তত্ত্ববস্তু মিশিয়া বাউল গানে এক দুর্বোধ্য ও জটিল তত্ত্ববস্তুর সমন্বয় হইয়াছে।' তবে পৃথিবীর অনিত্যতাবোধ বাউলদের মধ্যে অন্তঃশীল হয়ে থাকে। এই অনিত্যতাবাদের পিছনে বৌদ্ধ প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। বৌদ্ধদের একটা বড়ো অংশ ইসলাম নিয়েছিল। বৌদ্ধ অনিত্যতাবাদের স্মৃতি তারা বয়ে বেড়িয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মনে আসে জসীমউদ্দিনের একটি দ্যোতক মন্তব্য:[১১]

> আমরা বলিব বাউলেরা কবি নন তার্কিক, দার্শনিক, যুক্তিবাদী। নদীয়াতে একসময় নব্য ন্যায়ের খুব চর্চা হইত। বড় বড় শ্রাদ্ধে অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মতামত লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। মুসলমান মৌলানারাও সে বিষয়ে কম যাইতেন না। তাঁহারাও মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া নানা মত লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতেন। এইসব তর্কযুদ্ধ সময় সময়ে লাঠি-যুদ্ধেও পরিণত হইয়াছে। এই তর্কযুদ্ধগুলির প্রভাব গ্রামগুলিতেও পড়িয়াছিল। নব্য ন্যায়ের দেশ নদীয়া জেলায় যে লালন ফকীরের আবির্ভাব তাহার মতবাদও এই তর্কযুদ্ধের প্রভাব কিনা কে

বলিবে ?

সুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান—
বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কীসে রে।

এই অকাট্য যুক্তি লালন কোথায় পাইলেন ? বস্তুতঃ লালনকে আমি একজন দার্শনিক যুক্তিবাদি বলিয়া মনে করি। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের তত্ত্ববস্তুগুলি অতি সুন্দরভাবে নিজের গানের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই যুক্তিবাদ মূলত মারফতিদের শাস্ত্র। কোথাও-কোথাও মারফতি গানকে এইজন্যেই "বিচার গান" বলে। সেই বিচারের কষ্টিপাথরে লালন হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে যুগপৎ প্রশ্ন করেছেন। তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চবর্গের ধর্মবিশ্বাস কেবলই যুযুধান হয়েছে। হিন্দু বিশ্বাস সম্পর্কেও লালন কতটা সংশয়ী ছিলেন তার প্রমাণ এই প্রশ্নে :

ম'লে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হবে কেন বলে ?
ম'লে হয় ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেন এত জপতপ এত করে জলেস্থলে ?

যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতেই মিশায়
তবে ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে ?

যুক্তিবাদী লালন কেবল জাতিবর্ণ সম্পর্কে প্রশ্নাকুল ছিলেন না, তাঁর সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল বহুমান্য শাস্ত্র, মন্ত্র, দেব-মূর্তি, পূজা ও নামাজবিধি, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-ব্রত-উপবাস, বৈরাগ্যসাধন বিষয়ে। পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় লোকবিশ্বাসের ফাঁকিজুকি, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, জিন-ফেরেস্তা বা পেঁচোপেঁচির উপর নির্ভরতা, আলেয়ার ডাক ("আলাভোলা") বা মিথ্যার প্রতারণা ("ভাকাভুকো") তাঁর মনে হয়েছে হীন চেতনার অন্তঃসারহীন ("ফ্যাক্‌সা") বেঁচে থাকা। একই কারণে ইসলাম-নির্দেশিত "আকিদা" (বিশ্বাস) তিনি মানেন নি। ইসলামিয়াতে দাখিল হতে গেলে সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যিক। আল্লাহ্‌, ফেরেস্তাগণ, আসমানি কেতাবসমূহ, রাসুলগণ, শেষ বিচারের দিন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং অদৃষ্টের ভালোমন্দ।

লালন সরাসরি ইসলামের শরিয়ত পন্থাকে খারিজ করে বলেছেন : মারফতই প্রকৃত পথ, তবে তাতে হতে হবে "নির্বিকারী কারণধারী"

শরিয়তের বুনিয়াদে পারে না তা কোনমতে
জানা যাবে মারেফতে যদি মনের বিকার যায়।

এর পরে শরিয়তি সাধনার পাঁচটি কৃত্য কালেমা, যাকাত, নামাজ, রোজা ও হজের মধ্যে লালনপন্থা শেষ চারটির প্রতি আস্থাশীল নয়। এ সবই তাদের কাছে আনুষ্ঠানিক ও অন্তঃসারহীন। এ সব "সাহেবি" (প্রকাশ্য) ধর্মাচারের বদলে তারা "বাতুনি" (গোপন, গুহ্য) ক্রিয়াকর্মে উৎসাহী। শরিয়তি পবিত্র-অপবিত্র বস্তু বলে যা নির্দেশিত তার মধ্যে অনেক "হারাম" ও "নাপাক" বস্তু লালনপন্থায় গ্রাহ্য। লালন এক-পা এগিয়ে আরেকটি অনৈসলামিক ঘোষণা করেছেন তাঁর গানে :

যে হি মুরশিদ সে হি খোদা।

আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি।

আল্লা, নবী ও আদম একই ব্যক্তি এমত ঘোষণা খুব সাহসী। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন কোরান ও তার পরবর্তী গ্রন্থগুলি পবিত্র ও ঈশ্বরপ্রেরিত, তা আল্লার বাণী। লালনের যুক্তির শাস্ত্র এই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে প্রশ্ন করেছে :

কি কালাম পাঠাইলেন আমার সাঁই দয়াময়
এক এক দেশে এক এক বাণী কোন্ খোদা পাঠায় ?
যদি একই খোদার হয় বর্ণনা
তাতে তো ভিন্ন থাকে না

মানুষের সকল রচনা তাই তো ভিন্ন হয়।

লালনের প্রশ্ন : সব গ্রন্থ যদি আল্লার বাণী হত তবে দেশে-দেশে তার পার্থক্য ও পাঠভেদ থাকত না। তাছাড়া 'খোদাও এক এক সময়ে এক এক দেশে এক এক বাণী পাঠাতে পারেন না। 'সর্বকালের ও সর্বদেশের জন্য তো তাঁহার বাণী একই হইবে। অতএব ঐ সমস্ত কিতাব আল্লাহর বাণী নহে। উহা মানুষেরই রচিত কিতাব।'[১২]

এইসব যুক্তি ও বক্তব্যের ক্রম অনুধাবন করলে বোঝা যায়, লালন হিন্দু ঘরে জন্মালেও হিন্দুধর্মে তাঁর আস্থা ছিল না, মুসলমান ঘরে জন্মালে বা ধর্মান্তরিত মুসলিম হলেও ইসলামি নির্দেশ মানতেন না। তিনি কোনো অর্থেই ছিলেন না আউলিয়া সুফি সাধক। পরম্পরিত লোকায়ত মতের গভীর নির্জন পথে তিনি ছিলেন এক সাহসী ও প্রতিভাশালী পদাতিক। তাঁর রচনা সেই করুণ রঙিন পথপরিক্রমার শিল্পিত পদাবলী।

উল্লেখপঞ্জী

১. "ইস্পাত", সাপ্তাহিক। কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। ৭ ডিসেমবর ১৯৮৮।

২. দ্রষ্টব্য, ১৫শ অধ্যায়। মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস : মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ঢাকা, নভেমবর ১৯৬৫। পৃষ্ঠা ৮১।

৩, ৪. ওই। পৃষ্ঠা ৮৩, ৮৮।

৫. বাউলতত্ত্ব : আহমদ শরীফ। বাংলা একাডেমী পত্রিকা। ঢাকা। ৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। মাঘ-চৈত্র ১৩৭০। পৃষ্ঠা ২৬-২৭।

৬. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩২। বাঙ্গালীপুর, পোঃ সৈয়দপুর, জেলা রংপুর। পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০।

৭. দ্র. লালন সাহিত্য ও দর্শন : খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত। ঢাকা, ১৯৭৬। পৃষ্ঠা ৩৬।

৮. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। পৃষ্ঠা ১৭৫।

৯. "লালন শাহ"। দ্র. হারামণি : মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন; ৫ম খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৪। পৃষ্ঠা ২২৬ ২৩৩।

১০. Hindu Castes and Sects. Calcutta 1896. pp 482-83.

১১. মুর্শীদা গান। [পরিচয়বিহীন], "মুর্শীদা গান ও বাউল গান" অধ্যায়। পৃষ্ঠা ৬-৮।

১২. এই উদ্ধৃতি ও ইসলাম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তথ্যসূত্র : বাউল মতবাদ ও ইসলাম : এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দিন। কুষ্টিয়া, ১৯৬৯। দ্র. "বাউল সাধনার পদ্ধতি ও ইসলামী শরিয়ত" অধ্যায়। পৃষ্ঠা ৩৬-৪২।

ফালানি

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

পাটের ফেঁশোর মতো লালচে অবিন্যস্ত একরাশ চুল উড়ছে। পরনের ন্যাকড়াটা এক সময় সাদা ছিল। এখন মেটে। নোংরা। শতছিন্ন। লজ্জা নিবারণ করা দায়। হাতে-পায়ে খড়ি উঠেছে। মুখ রুক্ষ। চামড়ায় কুঞ্চন। বয়স কত বোঝা যায় না। পঁচিশ হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে। তার নিজের একটা হিসেব আছে। হিসেবটা তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। সেই একবার ভীষণ ঝড়-জল-বন্যায় প্রলয় কাণ্ড হয়েছিল, তখন তার মা গাছের ওপর তৈরি মাচায় তাকে প্রসব করেছিল। সকলের তখন তার উপর কী রাগ! তার ঠাকুমা বলেছিল, 'জলে ফ্যালাইয়া দে রাক্কসীটারে। ওটা গিলতে আইছে।' কিন্তু ওর মা বুকে জড়িয়ে রেখেছে কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে। মায়ের এই হিসেব থেকে তার বয়সের হদিশ করা সম্ভব নয়। তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে কপালের ওপর থেকে অবিন্যস্ত চুলের গোছা দু-হাত দিয়ে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে, ক্ষয়ে-যাওয়া হলদে দাঁত বের করে কলের পুতুলের মতো ঘ্যাসঘেসে গলায় তার জীবন-বৃত্তান্ত একই সুরে বসে যায়। সে বলে, 'হেই থিকাই তো আমার নাম ফালানি অইল।'

সেই ফালানি নদীর ধারে মিউনিসিপ্যালিটি যেখানে জনজাল ফেলে সেখানে সেই ভাগাড়ে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সারাদিন কী খোঁজে। এই তার কাজ। সারাদিন কিসের সন্ধানে সে ঘোরে! পশুর হাড়, তোবড়ানো কৌটো, প্লাস্টিকের প্যাকেট, ভাঙা শিশি-বোতল পেলে বস্তায় ভরতে থাকে। বস্তা ভরতি হলে সাউজীর ডেরায় দিয়ে আসে। টাকা পায় নগদ। এই তার দিনের রোজগার। এই তার পেটের ধান্দা।

শুধু পরিত্যক্ত জিনিস নয়। অন্য কিছু খোঁজে সে। আঁতি-পাঁতি করে খোঁজে। ভাবে, হয়তো একদিন মিলেও যেতে পারে সেই অমূল্য ধন। খুঁজতে-খুঁজতে তার দু চোখ ছাপিয়ে জল নামে শুকনো গাল বেয়ে। নদীর জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলতে থাকে যেন দু-চোখ ঘিরে। ফালানি জলের শব্দের মতো আপন মনে হেসে ওঠে কখনো-কখনো। হলুদ বীভৎস দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। দু কষ বেয়ে লালা ঝরে। তার নিভন্ত চোখের তারায় ফুটে ওঠে কোনো উজ্জ্বল আভাস। আবার সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। যারা লক্ষ করেছে, তারা বলে, 'পাগলি'।

ফালানি নদীর ধারে বসে বহমান জলের স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে কখনো-কখনো। নিজের চুল ধরে টানে। চুলকোয়। উকুনের বাসা ওই মাথা। সে অস্থির হয়ে ওঠে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ডগায় সে একটা জীবনকে অনুভব করে। টিপে ধরে। টেনে বের করে এনে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের নখে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে টিপে মারে। ফালানি হেসে ফেলে। অদ্ভুত সুখানুভূতি হয়। তার চোখ বুজে আসে। সে ভাবে, বড়ো লোকের বিবিরা নখে রঙ লাগালে যেমন হয়, তেমনি তার নখও রাঙা হয়ে উঠছে যেন। একটার পর একটা পটপট আওয়াজ তোলে সে নখের ওপর। 'আলায় নিংবইংশারা মাথাডা কুইর‍্যা-কুইর‍্যা খায়; আজ আর একডারেও রাখুম না।' আপন মনে এই কথা বলে সে ঘন-ঘন হাত চালাতে থাকে চুলের মধ্যে।

জনমদুখিনী সে। তার পোড়া কপাল। বন্যার কলকল জলস্রোতের উপর মাচায় তার জন্ম। সেই থেকে জলের মতোই তার জীবনপ্রবাহ। কীভাবে যে শরীরের মধ্যে জীবনটা রয়ে গেল সেটাই আশ্চর্য।

একে-একে সকলেই তাকে ছেড়ে গেছে। কাউকেই সে আপন করে বাঁধতে পারে নি। শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়িয়েছে এখানে-সেখানে। কে ছিল তার! কে-ই বা আছে! শুধু জলের সঙ্গে তার সখ্য। জল দেখলে আনমনা হয়ে যায়। নদীর স্রোতে সে নিজেকে খুঁজে বেড়ায় হয়তো। কিংবা কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, কী এক অদ্ভুত আকর্ষণ সে অনুভব করে।

জলই তো তার সব নিয়েছে। জন্মের সময় যে বন্যা হয়েছিল, সেই স্রোতের টানে বাপ যে কোথায় ভেসে গেল তার আর হদিশ পাওয়া যায় নি। সোমত্থ ছেলে হারিয়ে তার ঠাকুমা কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি একদিনের জন্যও সহ্য করতে পারে নি ফালানিকে। ওকে দেখলেই যেন জ্বলে উঠত, বলত, 'খা, খা, আমারে খা।' কান্নায় ভেঙে পড়ত বুড়ি। শেষে অনুনয়ের সুরে গলা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে বলে উঠত, 'অরে ফালানি, আমারেও তর বাপের মতো খাইয়া ফ্যালা।' তার যেন দৃঢ় বিশ্বাস, ফালানিই তার বাপকে খেয়েছে।

এইরকম শুনতে-শুনতে এক সময় তার মনে হত, সত্যিই হয়তো সে তার বাপকে খেয়েছে। নিজেকেই তার ঘেন্না করত। রাগ হত। দু-চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ত। মরে যেতে ইচ্ছে করত ফালানির। ঘরের পিছনে হিজল গাছটার নীচে গিয়ে বসে থাকত। তার সামনে একটা মরা ডোবা। সবুজ পানায় ঢাকা। এক ধরনের জলজ গন্ধ উঠে আসত। চারিদিকে স্যাঁতসেঁতে ভাব। ফালানির হাত-পা শিথিল হয়ে যেত।

বুড়ির বকবকানির বিরাম ছিল না। সে প্রায় সারাক্ষণ যা মুখে আসত বলে যেত। ফালানির অসহ্য লাগত। হিজল গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসে-বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে দিনের আলো নিভে এলেও সে থাকত অনড়।

সন্ধে হয়ে গেলে মা বাড়ি ফিরে খোঁজ করত ফালানির। এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াতে হত না। কুপি হাতে হিজলগাছের নীচে এসে হাত টেনে তুলত। 'উঠ্, কোন্‌দিন তরে ভূতে খাইব।' ফালানি মনে-মনে বলত, 'খায় না ক্যান, বাইচ্যা যাইতাম। বুড়ির বাক্যি আর পরানে সয় না।' কিন্তু তার মায়ের মুখের ওপর কিচ্ছু বলতে পারত না, পাছে মা দুঃখ পায়। মা-কে বড়ো দুঃখী মনে হত ফালানির।

মা খাবার নিয়ে আসত। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে

আনা নানা ধরনের জড়াজড়ি করে থাকা খাবারের পুঁটলি খুলে বসত মা। তাকে ঘিরে ফালানি আর বুড়ি ঠাকুমা। খাবারের গন্ধে অন্ধ বুড়ির জিভে জল আসত। সুরুত করে লালা ঝরে পড়ত কখনো-কখনো। ফালানির রাগ হত বুড়ির নোলা দেখে। কিন্তু মায়ের চোখ দুটো কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠত।

ভাবতে-ভাবতে সে সুদূর অতীতে হারিয়ে যায়। সামনে নদীর স্রোত মমতাহীন, কালগ্রাসী। নদীর কল-কল শব্দ কেন যেন তাকে তোলপাড় করে, ছিন্ন-ভিন্ন করে।

হঠাৎ মাথায় ভিতর চিড়বিড় করে ওঠে ফালানির। 'উকুনগুলান খাইয়া ফ্যালাইব আমারে, উঃ, আর পারতাছি না।' চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে দেয় ফালানি। পিছনে কতকগুলি বাচ্চার কলকলানি শুনে সে ফিরে তাকায়। দেখে, ওরা এসে গেছে। তার ভাগীদার। ওদের দেখে খুন চেপে যায় ওর মাথায়। চিৎকার করে ওঠে, 'ভাগ্ ভাগ্ এইখান থিক্যা, শালা ইতরগুলা এইখানে আইসা জুটছে।'

'তোর বাপের ভাগাড় না-কি?' বাচ্চাগুলোর মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে ফালানির উদ্দেশে। ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কেউ আমল দেয় না ফালানিকে। তবু সে বলতে থাকে, 'এইখানে আইছস ক্যান, আমি আগে আইছি, ভালো চাস তো চইল্যা যা।'

একটা ঢ্যাঙামতো ছেলে হি-হি করে হাসতে-হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, চলে যাব, এটা ওর ভাতারের ভাগাড় তো।'

ফালানি ঢিল ছোঁড়ে। পাগলের মতো চেঁচাতে থাকে যেন। ওদের পিছনে-পিছনে ছুটে বেড়ায়। প্রায় নগ্ন ফালানি ঘূর্ণির মতো ঘুরতে থাকে যেন। এ ভাগাড়ে সে কাউকে তার ভাগীদার হতে দেবে না।

এক সময় ক্লান্ত ফালানি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। তার চেঁচানি অদ্ভুত এক গোঙানিতে পরিণত হয়। শুকনো পাকানো শরীর কাঁপতে থাকে। সে ভাবে, হেরে যাচ্ছে—এখানেও হেরে যাচ্ছে। দখল হয়ে যাচ্ছে এই ভাগাড়। এখান থেকেও তাকে হয়তো সরে যেতে হবে। রোজগারের পথ বন্ধ হবে। তখন কোথায় যাবে সে?

কিন্তু শুধু রোজগারই তো তার একমাত্র ধান্দা নয়। সেই বস্তুটির খোঁজও তো তাকে চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম। ফালানির কাছে সেটার মূল্য অনেক। একটা স্মৃতিচিহ্ন। বুকের কলিজার থেকেও দামি। মায়ের কাছ থেকে সে পেয়েছিল সেটা।

মা তো আর আজ নেই। চিরকাল কেউ থাকেও না। কিন্তু মায়ের চলে যাওয়াটা তার কাছে বিস্ময়ের। অত কষ্ট বোধ হয় সহ্য করতে পারে নি তার মা। কোন্ সুখের আশায় সেই বিষণ্ণময়ী কোথায় প্রস্থান করল কে জানে? ওই চলে যাওয়ার জন্য ফালানির মনে কখনো ক্ষোভের সঞ্চার হয় নি। কাউকে হারানো তার কাছে স্বাভাবিক। বাস্তব। নির্মম সত্য।

তবু মায়ের চলে যাওয়াটা খুবই আকস্মিক। সেদিনও সন্ধে থেকে অন্ধ বুড়িটা আর সে অপেক্ষা করছিল মায়ের জন্য। খাবার নিয়ে এলে তারা খাবে। সারাদিনের উপোসের পর খাওয়া। সারা শরীরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি। মুখের ভিতর জল কাটতে থাকে। সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি নামে। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়। কিন্তু মা আসে না।

বুড়িটা মাঝে-মাঝেই চিলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ ফালানি, বউ আইল? প্যাটের মধ্যে রাক্কসটা যে জাইগা উঠসে। আর পারি না।'

ফালানি চুপ। কথা নেই। শব্দ নেই। অজানা আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে হাতুড়িপেটার শব্দ। কিন্তু সে শব্দ ফালানি ছাড়া আর কে শুনতে পাবে।

কিন্তু বুড়ির চিৎকারের বিরাম নেই। 'অ ফালানি, সাড়া ছ্যাস না ক্যান? বউ আইল?'

'আইলে তো জানতেই পারতা।' ফালানির স্বর মিহি হয়ে আসে। জিভটা কেমন যেন আড়ষ্ট। হাত-পা দুর্বল। থিরথির করে যেন কাঁপে। সে ভাবে

খাবারের চেয়েও মায়ের ফিরে আসাটা জরুরি। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না ফালানিদের।

সেই রাতের পর কত দিন কত রাত কেটে গেছে। ফালানির মা ফেরে নি। পরে শুনেছে, তাদের পাশের বস্তিতে থাকত চটকলের ছোকরা কুলি আলি, ওর সঙ্গে দূরে কোথায় ভেগে গেছে। যাওয়ার দিন সকালে মা তার একমাত্র গহনা রুপোর চেনটা আদর করে ফালানিকে গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। তখন কি আর সে বুঝতে পেরেছিল যে, মায়ের বুকের মধ্যে একটা কালসাপ ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল!

মায়ের কথা মনে পড়তেই তার বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠল। ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ছেলেগুলো এখনো কাঠি হাতে বস্তা কাঁধে ভাগাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে কী সব তুলছে, বস্তায় ভরছে।

ফালানির এখন আর সেদিকে নজর নেই। এই ভাগাড় রাজত্বে এক সময়ে সে একাই ছিল। কখনো-সখনো দু-একজন মাল কুড়াতে-কুড়াতে এখানে চলে আসত। কিন্তু এখন দিনে-দিনে ভাগীদারের সংখ্যা বাড়ছে। পিল-পিল করে কোত্থেকে এসে জুটছে এই শকুনের দল। এদের দেখলেই ফালানি ক্ষোভে ভয়ে দু-চোখে আঁধার দেখে। এরা সব লুঠে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই হারিয়ে-যাওয়া বস্তুটা কে কবে পেয়ে যাবে কে জানে! বিশেষ করে এই কথাটি মনে পড়লে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

কুড়ানিদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে ফালানির দিকে। সে একটু ভীত, সন্ত্রস্ত। কে জানে, খেপি কখন কী করে বসে। মেজাজে না মিললে কামড়ে-আঁচড়েও দিতে পারে। এমনিতেই ওর এখন তিরিক্ষি মেজাজ। তবু ছেলেটি এগোয়। লম্বা কাঠির মতো রোগা-রোগা হাত-পা, দেখে মনে হয় শরীর থেকে আলগা। মুখটা গোল। রুক্ষ। ক্ষত-বিক্ষত। চোখ প্রায় স্থির। ভাষাহীন। সে সন্তর্পণে ফালানির পিছনে এসে দাঁড়ায়। মিহি-গলায় বলে, 'কারে ঠেকাবি? সকলেই আস্‌পে। তরে খেপায়। চেঁচাস ক্যান?'

ক্ষিপ্ত ফালানি উদ্যত সাপের মতো ফিরে তাকায়। তার ভাটা-পড়া চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে। নাকের পাটা ফুলে ওঠে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরটা কাঁপতে থাকে। প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠে, 'তুই এখানে আইছস ক্যান। তুই আমার কোন্ কালের ইয়ে যে আমার দুঃখে পাগল হইছস।'

'না। তরে অমন করলে আমার খুব দুঃখু অয়।'

'ক্যান?'

'জানি না।'

'জানস না তো এখান থিক্যা চইলা যা।'

'শুন্…"

'বটা, আর কথা কইস না, অখনো ভালো চাস তো সইরা পড়।'

বেগতিক দেখে বটা সরে আসে। একটু তফাতে ফণিমনসার ঝোপের পাশে পা ছড়িয়ে বসে। কোমরে গোঁজা কৌটো থেকে বিড়ি বার করে ধরায়। চোখ বুজে টানে। ধোঁয়া ছাড়ে একরাশ। বটার ঝিমুনি আসে। আজ আর ভালো লাগে না। কাজে মন নেই।

ফালানি ঘাড় ফিরিয়ে বটাকে দেখে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার আঁকি-বুঁকিকাটা মুখটা। ফণিমনসার ছায়ায় বসে ক্লান্ত বটা কী ভাবছে কে জানে! ওকে খিঁচিয়ে ওঠার জন্য ফালানির এখন নিজেরই খারাপ লাগছে। কিন্তু কী করবে সে? মাথার ভিতরটা তার কেমন যেন করে ওঠে। সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।

হাতে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে ওঠে ফালানি। হুশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আস্তে-আস্তে এগিয়ে যায় বটার কাছে। পাশে বসে। বটা স্থির। নদীর দিকে মুখ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফালানি ভাবে, বটাটা কেমন যেন। ওর ভাবসাব অন্যরকম। কী যে ভাবে সব সময়। ফালানি নীচু

স্বরে বলে, 'রাগ করছস? আমার মাথাডা ঠিক থাকে না।'

বটা হাসল। মাথা নাড়ল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'না, তর ওপর রাগ করি নাই। রাগ করব কেন? তোকে ওরা ওরকম করে কেন? তোকে মানুষ মনে করে না?'

'না। ভাগাড়ে মাইনষে থাকে নাকি? আমরা তো ভাগাড়ের শকুন। তুই ভাগাড়ে আইসস ক্যান? তুই অন্য কাম করতে পারস না?'

'কাজ? কোথায় পাব? কে দেবে কাজ?'

'তুই খুইজ্যা ল, বটা। এখানে আসিস না।'

ফালানির গলায় দরদ। তার মরা চোখও চিকচিক করে ওঠে। বটা ফালানির নোংরা, খসখসে, ক্ষয়া-নখঅলা হাতটা ধরে। ফালানি চুপ। কিছু বলে না। শুধু বটার দিকে তাকিয়ে থাকে। দুজনকে ঘিরে নীরবতা।

অনেকক্ষণ কেটে যায়।

বটাই প্রথম কথা বলে, 'চ ফালানি। আমরা ভাগাড় ছেড়ে দিই। এখানে আর ভালো লাগে না।'

'খাবি কী?'

'কাম না পেলে ভিক্ষে করে খাব।'

'ভিক্ষে মেলে না রে, বটা।' ক্লান্ত ফালানি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ভিক্ষে করার অভিজ্ঞতা ফালানির আছে। মা চলে যাওয়ার পর খাওয়া জুটত না। অন্ধ ঠাকুমা পেটের জ্বালায় চিলের মতো চেঁচাত সবসময়। ফোকলা মুখটা হাঁ করে থাকত, যেন গোটা পৃথিবীটাই গিলে ফেলবে। ফালানির রাগ হত। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। কী করবে সে! কোত্থেকে যোগাবে সে খাবার! অথচ না খেয়ে দিন কাটানো দায়।

একদিন বুড়ো ঠাকুমার হাত ধরে রাস্তায় নামল সে। কিন্তু রাস্তায় নামলেই কি আর ভিক্ষে মেলে! ভিক্ষে চাইতে জানতে হয়। চাইতে শিখতে হয়। এটা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল ফালানি। বুড়িটা কিছুই বুঝত না। শুধু চেঁচাত। এমনভাবে চিৎকার জুড়ে দিত, মানুষের দয়া তো দূরের কথা, বিরক্তিই উৎপাদন করত।

তাও প্রথম দিকে কিছু মিলত। কিন্তু ক্রমশ আয় কমতে লাগল। খিদে তো কমে না। ফালানি দিশেহারা হয়ে পড়ত। তার ওপর ছিল আরেক উৎপাত। পুরানো ভিখিরিরা একজোট হয়ে ওদের পিছনে লাগত। কখনো-কখনো কেড়ে নিত সর্বস্ব। কিছুই করার বা বলার উপায় ছিল না ওদের। ফালানি অসহায়। মাঝে-মধ্যে অবশ্য অন্ধ বুড়ি অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিত। তাতে সমস্যার সুরাহা হয় নি।

সমস্যার সমাধান হয়েছিল বুড়ি মরে গিয়ে। ফালানিকে আর ভিক্ষে করতে যেতে হয় নি। আর কী দিয়েই বা ভিক্ষে করবে? মূলধন ওই অন্ধ বুড়িটাই তো ছিল না। ভিক্ষের সমস্যা মিটলে কী হবে, নিত্য নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে লাগল ফালানি।

ফালানি বটাকে আস্তে ঠেলে দিয়ে বলে, 'ভিক্ষার রাস্তা সহজ মনে করতাছিস? ওই রাস্তায় যাইস না। পারবি না। আর, বড়ো অপমান রে!'

'ভাগাড়ে তর মান থাকে?' বটার চোখে বিদ্রূপ ঝিলিক দেয়।

'থাকে। তাও থাকে রে। ভিক্ষার থিক্যা ভালো।'

তবু বটা ভাগাড় থেকে ফালানিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। জানে ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। ওর রক্তের প্রবাহে ভাগাড় মিশে গেছে। এখানকার রূপ-রস-গন্ধ হয়তো ফালানিকে উতলা করে তোলে। কী এক অদম্য নেশায় যেন সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছে। বটার বুকের ভিতরটা মোচড় দেয়। গলার মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি। বটা ভাবে, ফালানিটা হয়তো আর সুখ-দুঃখ, মান-

অপমান কিছুই বোঝে না; শুধু একটা কিসের যন্ত্রণা তাকে কুরে-কুরে সারাক্ষণ খায়। এই যন্ত্রণার ভার সে একাকী বয়ে বেড়ায়। বয়ে বেড়ায় ভাগাড়ের মালভরতি চটের ছেঁড়া বস্তা। মান-অপমান এবং ভাগাড়ের মাল নিয়েই তার জীবনের 'বেত্তান্ত' সুখে-দুঃখে হয়তো টই-টম্বুর হয়ে ওঠে। তবু বটা তাকে এই নরক থেকে বার করে নিয়ে যেতে চায়।

নড়ে-চড়ে বসে বটা। তার সামনে বসে ফালানি আপন মনে বিড়বিড় করে কী বলতে থাকে বোঝা যায় না। বটা ওর ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে, 'কী বলিস? এই নরক থেকে চ। যা করে হোক আমি তোকে খাওয়াব।'

ফালানি ফুঁসে ওঠে। 'নরক? সগ্‌গ কোথায় পাবি? কোন্ ঘরে জন্মাইছস?' তার পরেই হেসে ওঠে। বলে, 'তুই যা। তরে কে থাকতে কইছে? আমি এখানেই থাকুম।'

ফালানি তাকিয়ে দেখল আকাশ থেকে পাক খেতে-খেতে একঝাঁক শকুন নেমে আসছে ভাগাড়ে। শকুনের নানা আকারের ছায়ায়-ছায়ায় ঢেকে যেতে লাগল এই এলাকা। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখন ঠিক মাথার ওপরে উড়ো জাহাজের মতো শকুনের ওঠানামা। ফালানি উঠে দাঁড়াল। অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ করল।

ফালানি আর দাঁড়াতে পারে না। সে অস্থির হয়ে ওঠে ভিতরে-ভিতরে। রক্তের স্রোতে চনমনে অনুভূতি। শকুনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নিশ্চয় ভাগাড়ে কিছু পড়েছে। দিন কয়েক পরেই হাড় মিলবে। সে জানে, এই হাড় নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। মারামারি হবে। হাড়ের চিমসে গন্ধ যেন তার অনুভূতিকে নাড়া দেয়। সে স্বপ্ন দেখে, অনেক হাড়ের সে অধিকারী। ফালানি অনেকটা শকুনের মতো দুটো হাত মেলে দিয়ে পাক খেতে-খেতে ভাগাড়ের দিকে নেমে যায়। তার পরনের ত্যানাটা উড়ছে। উড়ছে পাটের ফেঁশোর মতো চুল। হালকা শরীরটা বাতাসে ভর করে ছেঁড়া কাগজের মতো যেন পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে। দিনকয়েক পরের কথা ভেবে সে খুশি হয়ে ওঠে। তার পাঁজর-ঘেরা কলিজায় এখন সুখের হাওয়া।

বটা অবাক হয়ে দেখে ফালানিকে। ওকে সেই যাত্রার মেয়েটার মতো মনে হয়। গত বছর শীতকালে রেল-মাঠে কলকাতার যাত্রাদল এসেছিল। কত লোকের ভিড় হয়েছিল টিকিট কেটে যাত্রা দেখার জন্য। চারিদিকে কড়া পাহারা। বটা চটের ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে দেখেছিল। থোঁচাও খেয়েছিল। সে তন্ময় হয়ে একটা মেয়েকে হাওয়ায় ভেসে-ভেসে নাচতে দেখেছিল। রাতে ঘুমের ঘোরে সেই নাচনে-ওয়ালি তার চারদিকে ঘুরে-ঘুরে নাচতে-নাচতে তাকে যেন জড়িয়ে ধরেছিল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। একটা অসহ্য সুখময় যন্ত্রণায় সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বটার স্মৃতিতে অনেকদিন সেই নাচনেওয়ালি আনা-গোনা করেছে। আজ আবার যেন জেগে উঠেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে মেয়েটির মুখ আজ আর মনে পড়ছে না। বিবর্ণ ধূসর স্মৃতিতে সে শুধুই একটি অবয়ব মাত্র। সেই অবয়বে আজ এখন ফালানি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বটা ফালানিকে চিৎকার করে ডেকে উঠল। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে একটা বোবা স্বর গোঙানির মতো বেরিয়ে এল। হয়তো শুনতেই পেল না ফালানি। সে এখন কী এক খেলায় মত্ত। ক্রমশই ওর চলনে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে বটা।

শকুনের তালে-তালে উড়ছে ফালানি। তার হাত দুটো ছড়ানো। হাতের সেই কাঠিটা নেই, যেটা দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে মাল খোঁজে। ভাগাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শকুনের দল এসে বসে, যেন গালিচা পাতা হয়েছে। মাঝে-মাঝেই ওদের মধ্যে চাঞ্চল্য। মাথার উপরে উড়ছে এখনো অনেক শকুনের দল। মরা গাছের ডালে বসে তাদের সতৃষ্ণ দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে। মরা গাছটাতে জীবনের স্পন্দন অনুভব করে বটা। লক্ষ করে মৃতপ্রায় ফালানির

দেহে প্রাণের চাঞ্চল্য। সে যেন শকুনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে।

হঠাৎ ফালানি পা ঘষতাতে থাকে। পা দিয়ে জনজাল সরিয়ে-সরিয়ে খুঁজতে থাকে সেই জিনিসটা যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার আবাল্যের স্মৃতি। তার এই সাধের সাম্রাজ্যে সে হারিয়েছে তার সেই সুখের স্মৃতি, কিংবা ভাসিয়ে দিয়েছে স্মৃতিভার, কিংবা সুখ-দুঃখে মেশামেশি ফালানির কাছে অনেক বড়ো সেই স্মৃতিচিহ্ন। এখন যেন ফালানির মনে খুশির হাওয়া স্তিমিত হয়ে আসে। তার হারানো সুখের দুঃখে আনমনা হয়ে যায়। সে আঁতি-পাতি করে খুঁজতে থাকে তার হারানো বৈভব।

একটি শকুন অলস ডানা মেলে ফালানির সামনে দিয়ে ধীর গতিতে উড়ে যেতেই দেখা গেল রুপোলি ঝিলিক। সে বিস্ময়ে বিমূঢ়, স্থির, অনড়। মাথার ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল। শকুনের পায়ে জড়িয়ে থাকা সেই রুপোর চেনটার রুপোলি ঝলকানিতে ভেসে উঠল তার মায়ের মুখ। সে তার মায়ের পবিত্র নির্মল নিষ্পাপ মুখটি যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। মমতাময়ী তার মায়ের স্নেহময় দৃষ্টি। তার বুকভরা ভালোবাসা। কিন্তু একদিন সে কোন্ সুখের টানে আলির সঙ্গে চলে গেল! হয়তো ভেসে গেল। ভাসিয়ে দিয়ে গেল ফালানিকে। এতে ফালানির কোনো অভিযোগ নেই তার মায়ের বিরুদ্ধে। ওই রুপোর চেনটার মধ্যে তার মায়ের অস্তিত্ব সে অনুভব করে। নিবিড় সুখ-স্মৃতি তাকে মত্ত করে তোলে।

ফালানি দেখে, শকুনটা মরা গাছটার ডালে গিয়ে বসেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা যেন ফালানির দিকে। লম্বা সরু উদ্ধত গলা নিয়ে যেন ফালানিকে উপেক্ষা করছে। মনে হয় শকুনটি সাত রাজার ধন এক মানিক নিয়ে গর্বিত। অথবা সে হয়তো নির্বিকার, নিশ্চেতন। দৃষ্টি শুধু ভাগাড়ের মরা গোরুটার দিকে। শকুনের চোখে লোলুপতা। ফালানি অত বোঝে না। বুঝতে চায় না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, যে করেই হোক রুপোর চেনটা ছিনিয়ে নিতেই হবে শকুনটার কাছ থেকে। এক সময় বস্তুটাকে আরেকটা শকুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সে ট্যাঁকে গুঁজে রাখত সারাক্ষণ। রামু শকুনটার লোলুপ দৃষ্টি ছিল ওটার ওপরেই। চুল্লুর পয়সা না থাকলেই ফালানির কাছে চাইত রুপোর চেনটা। বেচে খাবে। অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখত ফালানি। একদিন চুরি করেছিল রামু। কামড়ে-আঁচড়ে রক্তাক্ত করে ওর কাছ থেকে চেনটা উদ্ধার করেছিল। আর থাকে নি সে রামুর সঙ্গে। বিয়ে-টিয়ে তো নয়। এমনিই একসঙ্গে থাকত ঝোপড়িতে। ভালো লাগত। পরে চোরটাকে ভয় করত, ঘেন্না হত। আজ আবার আরেকটা শকুন রুপোর চেনটা নিয়ে গাছের ডালে বসে আছে। ওইটাকেও ফালানির রামু বলেই মনে হয়। ওটাকে চোখে-চোখে রাখতে চেষ্টা করে ফালানি। তার দৃষ্টি স্থির। সারা শরীর ঘিরে উত্তেজনা। সে কাঁপতে থাকে। মাল তার প্রায় হাতের মুঠোয়, তবু এক্তিয়ারের বাইরে। সে কী করবে, কী ভাবে এগোবে ভাবতে থাকে। অবশেষে এক পা এক পা করে গুটি-গুটি এগোতে থাকে। মরা গাছটার নীচে দাঁড়ায়। ওপরে তাকিয়ে দেখে শকুনটার পায়ে চেনটা ঝুলছে। বুকের ভিতর ধকধক করতে থাকে। মরা চোখেও ঝিলিক দিয়ে ওঠে আলো। সে ডান হাতটা তুলে 'হুশ' শব্দ করে। শকুনটা নির্বিকার। আবার, আবার তাড়া দেয় ফালানি। গলা বাঁকিয়ে তেরছাভাবে ফালানির দিকে তাকায় শকুনটা। ফালানি ভাবে, ওটার চাউনি অনেকটা চোট্টা রামুর মতো। এটা মনে আসতেই মাথার ভিতর চনমন করে ওঠে। পায়ের কাছ থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে শকুনটাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্য ব্যর্থ। শকুনটার পাশ ঘেঁষে ওটা সাঁ করে বেরিয়ে যায়। ঢিলটা গিয়ে পড়ে ভাগাড়ে বসে-থাকা একঝাঁক শকুনের ওপর। ওগুলো উড়তে থাকে এলোমেলোভাবে।

সেই শকুনটা বেগতিক দেখে ডানা দুটি মেলে উড়াল দেয়। ঠ্যাং থেকে চেনটা টুপ করে মাটিতে পড়ে। ফালানি দৌড়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয় তৎক্ষণাৎ। হাতের মুঠিতে শক্ত করে চেনটা ধরে চিৎকার করে ওঠে, 'পাইছি রে বটা, অ্যাদ্দিনে পাইছি। বটা, এইবার আমি তর লগে ঘর করুম।'

ভাগাড়ের নীচ থেকে বটার কাছে আসার জন্য ছুটতে শুরু করে ফালানি। কিন্তু হঠাৎই একটা বিশাল শকুনের ডানার ঝাপট লাগে ওর মুখে। সামলাতে পারে না ফালানি। টাল খেতে-খেতে চিত হয়ে যায়। রামু শকুনটা ঠিক এইভাবেই ঝাপটা মেরেছিল। উঠে দাঁড়িয়েছিল ফালানি। অনেক কষ্টে কামড়ে-আঁচড়ে বস্তুটাকে রক্ষা করেছিল। সে আর হারাবে না চেনটা। প্রাণপণে শক্তমুটিতে ধরে রাখে বস্তুটাকে। উঠে বসে। আবার শকুনটা এসে আঘাত করে। ফালানি চেঁচায়, বলে, 'আমারে শকুনে খাইল রে, বটা। আমারে লইয়া যা। তর লগে আমি ঘর করুম।' ঝাঁকে-ঝাঁকে শকুন ওড়াউড়ি করে। ফালানিকে ঘিরে নাচতে থাকে। শত-শত চোখ হিংস্র হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ নখে ফুটে ওঠে আক্রোশ। ফালানিকে আর দেখা যায় না। শকুনের ডানায়-ডানায় সে ঢাকা পড়ে যায়।

এর মধ্যে বটা আর ভাগাড়ের কুড়ানির দল হইহই করতে-করতে এগিয়ে যায়। শকুনের দল পিছোতে থাকে। ফালানির শরীরটা দেখা যায়। রক্তাক্ত। ওরা কাছে যায়। ফালানি গোঙাতে থাকে। বাঁ চোখটা নেই। খুবলে খেয়েছে। ক্ষত-বিক্ষত নাক, ঠোঁট, হাত-পায়ের পাতা। বুকের উপর রক্তমাখা মাংসের ডেলাটা ধকধক করছে। বটা ডুকরে কেঁদে ওঠে—'ফালানি, তুই আমার সাথে ঘর করবি না?'

নিথর নিস্পন্দ ফালানির রক্তাক্ত হাতের মুঠোয় রুপোর চেনটা বেলাশেষের আলোয় চকচক করে ওঠে।

রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে

গৌরী আইয়ুব

চতুরঙ্গ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমাকে প্রত্যুত্তর দেবার সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবু অকৃতজ্ঞের মতো বলি যে ড. কেতকী কুশারী ডাইসনের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বই দুটির যে-সমালোচনা আমি করেছিলাম সেটি প্রকাশ করার সময় আমার যে-পরিচয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনারা দিয়েছিলেন তাতে আমার উপকার করেন নি। 'মননশীল লেখিকা', 'বিবেকের তাড়নায়' লিখি ইত্যাদি বলে আমাকে বড়ো বেশি ভালনারেবল করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে আপনি যে সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সাধ্যও আপাতত আমার নেই। চার-পাঁচ মাস ধরে আমার বইপত্র থেকে ১২০০ মাইল দূরে পড়ে আছি। এমনকী ড. কুশারী ডাইসনের বই দুটিও হাতের কাছে নেই যে দুর্বল স্মৃতিকে একটু মার্জনা করে নেব বা প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি সংগ্রহ করব। তার ওপর আবার একটি কষ্টকর চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার শিকার হয়ে মানসিকভাবে এমন অস্থির হয়ে আছি যে আমার সবটুকু বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারব কিনা সন্দেহ।

ড. কুশারী ডাইসনের সুদীর্ঘ উত্তর পড়ে কোনো-কোনো বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ হল বলে উপকৃত বোধ করেছি। তবে উনি যে আমার সমালোচনা পড়ে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবেন এটা আমার অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এমন বিশদ আত্মপরিচয় দিতে ব্যগ্র হবেন তা ভাবি নি। এই ব্যাপারে তাঁর হৃদয়-স্পর্শী সারল্যে একটু যে অস্বস্তি বোধ করছি, একথাও না বলে পারলাম না। ক্ষমা করবেন।

ড. কুশারী ডাইসন জানিয়েছেন যে তাঁর বাঙলা বইটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতো বিদগ্ধ বহু ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করেছে। সে-কথাও আমার অজানা নেই। তাই সবিনয়ে বলব যে তাঁরা এই রচনায় যে-মহত্ত্ব দেখতে

পেয়েছেন তা যে আমার মতো বহু মধ্যম-শিক্ষিত ব্যক্তি দেখতে পায় নি এ আমাদের দুর্ভাগ্য এবং যথেষ্ট পরিশীলিত রুচির অভাবেই সম্ভবত এটা ঘটেছে। সমালোচনা লেখার সময় নিজেকে সাধারণ পাঠিকা বলাতেও লেখিকা দোষ ধরেছেন: বলেছেন, ঐ 'ছদ্মবেশটা অবান্তর।' আমার তো অবান্তর মনে হয় না। বাঙলা ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে হাজার-হাজার মানুষ আছেন যাঁদের বোধবুদ্ধি ও শিক্ষা আমারই সমপর্যায়ের। তাই আমি অসাধারণত্ব দাবি করব কিসের জোরে? অন্যত্র কোথাও কোথাও 'আমার' শব্দের বিকল্পে 'আমাদের' লিখেছি বলেও তিরস্কার করে বলেছেন যে গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করবার কোনো অধিকার আমার নেই। কারা আমায় তাদের মুখপাত্র নির্বাচন করেছে? আমি নাকি শুধু আমার কথাই বলতে অধিকারী। তাই আবার নিবেদন করি যে সমালোচনা লেখায় হাত দেবার আগে আমি আমারই মতো ২৫-৩০ জন স্ত্রী-পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করেছিলাম। একজন (যিনি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ছাড়া আর কেউই এই যুগান্তকারী প্রেমের উপাখ্যানটির প্রশংসা করেন নি আমার কাছে। বরং আমার চেয়েও তীব্রতর প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। এ অভিজ্ঞতাটা মনের পিছনে থাকাতেই বোধহয় বহুবচন ব্যবহার করে ফেলেছিলাম। সেজন্যও কি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে? সবাই তো আর বইয়ের সমালোচনা লিখতে বসতে পারেন না। তাঁদের কেউ-কেউ আবার ড. কুশারী ডাইসনের সমসাময়িক ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে—ইংরাজি সাহিত্যও পড়িয়ে থাকেন।

যাই হোক, বইটি যেহেতু লেখিকার স্বদেশে ও সমকালেই পুরস্কৃত হয়েছে তাই তাঁর গুণের যথাযোগ্য সমাদর লাভ করার জন্য ভবভূতির মতো নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর উপর বরাত দেবার প্রয়োজন নেই ড. কুশারী ডাইসনের। এবং এই কারণেই যদি তাঁর মনে আস্থা জন্মায় যে তাঁর এই পরীক্ষামূলক রচনা 'কালক্রমে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ' করবে তাহলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে সমকালের অনাদরকে যেমন, আদরকেও তেমনি যথেষ্ট মর্যাদা দিতে দায়বদ্ধ যে মহাকাল নয়, সে কথাও নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নেই।

অবশ্যই আমি দুঃসাহসী। তাই প্রশ্ন করি যে তাঁর এই রচনাটি যেহেতু অভিনব পরীক্ষামূলক তাই আমার মতো যারা এর গুণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সবাইকেই একবাক্যে 'সেকেলে' বলে বরখাস্ত করে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? তারা 'পুরানো দৃষ্টি-ভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকার ফলে নতুনের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কিতে পিছু হটতে বাধ্য' হবেই—এতখানি দৃঢ় নিশ্চিতিরও সঙ্গত ভিত্তি আছে কি? কোথায় যে তাদের আপত্তি সেটা ধৈর্য ধরে বুঝবার চেষ্টা করলে সম্ভবত লেখিকা হিসেবে তাঁর ক্ষতি হবে না।

বিজ্ঞানে যদি বা কখনও-কখনও নূতন তত্ত্ব পুরানোকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয় তবু সমাজের বিবর্তনে, শিল্প সাহিত্য ও মানবিক শাস্ত্রের নানা বিভাগের ক্রমবিকাশে যা প্রাচীন তা হার মানতে বাধ্য হয়ই—এমনটা সব সময় দেখা যায় কি? তা ছাড়া, সম্পূর্ণ 'নতুন' বলে কিছু আছে কিনা, এবং 'পুরানো যা কিছু তা সবই কালের দুর্বার স্রোতে ভেসে' গেলে সংস্কৃতি ও সমাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় কী করে—'ট্র্যাডিশন বনাম মডার্নিজমে'র এই-সব বিতর্কে আপাতত আমি প্রবৃত্ত হব না। কিন্তু গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে একথাও বলব যে, এমন কোনো-কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান থাকতে পারে বা আছেই যা চিরকালীন এবং সব নতুনকেই, প্রাথমিক ঝড়ের ধুলো থিতিয়ে যাবার পরে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ড দিয়েই বিচার করারও প্রয়োজন হয়। আর এভাবে বিচার করেই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় যে কোন্ 'নতুন' ধোপে টিকে সাহিত্যের মণি-কোঠায় ঠাঁই পাবে আর কোন্ 'নতুন' নিক্ষিপ্ত হবে আবর্জনার কুণ্ডে। নতুন মাত্রই শিরোধার্য—এমন

বিধান আমি অন্তত মানতে রাজি নই। 'যে-রচনা যত পরীক্ষামূলক সেই রচনা তত বেশি ঝড় তোলে' ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষামূলক হলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত কি? উত্তীর্ণ হয়েছে কি হয় নি, সে বিচার করার অধিকারী আমি কিনা এ-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমার বিপক্ষে যাবার আগেই আমার দুচার কথা পাঠকের দরবারে পেশ করে ফেলতে চাই।

একটি উপন্যাস এবং একটি সিরিয়স গবেষণা-কর্ম পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে দেখে প্রথমে আমার মনে কিছুটা সংশয় এবং সেই সঙ্গে একটা কৌতুক-মিশ্রিত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমার সমালোচনায় আমি ইতিপূর্বেই লিখেছি যে, 'আমি ভাবছিলাম কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়ত বা হয়েও উঠতে পারে এই অভিনব আঙ্গিকে।' 'সৃষ্টি এবং গবেষণা যে দুটি জল-অচল কামরা নয়'—তাঁর এই দাবি আমি অবশ্যই মানব। লেখিকার এই 'উচ্চ-স্তরের গবেষণা নিছক তথ্য সন্ধানের ব্যাপার নয়' এবং 'তাতে সৃজনশীল কল্পনাশক্তি'-ও যে তিনি ব্যবহার করেছেন এতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। তবে অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপারে সৃজন-শীলতার কোনো সীমা থাকবে কিনা এ নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না?

ড. কুশারী ডাইসনের তুল্য সব্যসাচী, কিন্তু সম্ভবত অধিকতর প্রতিভাধর, বহু ব্যক্তির সৃজন ও গবেষণার যুগ্ম আঙ্গিক যে সার্থক ফল প্রসব করেছে, সে সংবাদটুকু আমিও জানি। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব জাতীয় নানা মানবিক শাস্ত্রে বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে চলেছে, বেশ কিছুকাল যাবৎ তাতে কল্পনা-প্রবণ এবং সৃজনশীল কিছু জ্ঞানান্বেষী আপাত-বিচ্ছিন্ন নীরস তথ্যকেও গেঁথে নিতে পেরেছেন প্রাণবান ও নান্দনিক-গুণ-সম্পন্ন জ্ঞানচর্চায়। বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের কল্পনাসমৃদ্ধ নান্দনিক আবেদন যে কম নয় একথা বোদ্ধারা বলে থাকেন এবং কেউ-কেউ সেই অসামান্য অভিজ্ঞতাকে আমাদের বোধের পর্যায়েও এনে দিতে পেরেছেন।

তবু একটা কথা থাকে। ইমাজিনারি এবং ইমাজিনেটিভ—এই দুটি ইংরেজি শব্দের পার্থক্য বোঝাবার জন্য কাল্পনিক ও কল্পনাপ্রবণ শব্দ দুটি ব্যবহার করা যায় তো? একজন সিরিয়স গবেষক—তদুপরি তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীত-শিল্পী ইত্যাদি যাই হোন না কেন—নিশ্চয়ই ইমাজিনেটিভ/কল্পনাপ্রবণ হবেন। কিন্তু তাঁর গবেষণা-লব্ধ তথ্য বা তত্ত্ব ব্যাখ্যান করতে বসে তাতে যদি কিছু ইমাজিনারি / কাল্পনিক কাহিনী গুঁজে দেন এবং সেই কাহিনী সত্যিই যদি প্রাসঙ্গিক মনে না হয় কোনো-কোনো পাঠকের তাহলে কি বড়োই অসুবিধা হয় না? নান্দনিক উপভোগও ব্যাহত হয়, জ্ঞানের অনুসন্ধানও দিশেহারা হয়ে যায়।

ড. কুশারী ডাইসন লিখেছেন, 'যেসব খবর আমি আমার বইয়ে দিয়েছি সেসব আমার আগে আর কেউ রিসার্চ করে বার করতে পারলেন না কেন? তার কারণ কি এটা হতে পারে না—যে ঐ জাতের অনুসন্ধান করতে যে-ধরনের মন লাগে তা তাঁদের ছিল না? যে-মন অনামিকাকে কল্পনা করতে পেরেছে সেই মনই রিসার্চগুলোও করতে পেরেছে। বইটার মিশ্র আঙ্গিকের সেটাই প্রকৃত ভিত্তি।' ঘটনাবলীর অসাধারণ সম্পাতে এই যে একটি অচিন্তিতপূর্ব গবেষণা সম্ভব হয়েছে এবং বাঙলা সাহিত্যের জগতে একটি অনামিকার সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য ড. কুশারী ডাইসন চিরস্মরণীয়া হবেন—এমন প্রত্যাশা যদি তাঁর থাকে থাকুক, আমি ঈর্ষা করব না। তাঁর এই গ্রন্থের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম মুদ্রণ হতে থাকুক। তবু আমরা অনেকেই গ্রন্থটি একবার পড়বার পর দ্বিতীয় বার পড়তে কেন উৎসাহ বোধ করছি না, সেটা স্পষ্ট করে বলে তিরস্কৃত হবার অধিকারটুকুও যেন না হারাই।

সৃজনী সাহিত্য ও গবেষণার দুটি জাঁরকে একত্র মেখে নিয়ে যে অভিনব মিশ্র আঙ্গিক তিনি ব্যবহার

করেছেন সে বিষয়ে আমার তত আপত্তি হত না যদি ওই আঙ্গিকের প্রয়োগে এই বিশেষ রচনাটিকে একটি সার্থক সৃষ্টি বলে মনে হত। হয় নি বলেই তাঁর এই মিশ্র আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও তেমন মূল্য দিতে পারি নি এবং স্বাগত জানাতে পারি নি। না পারার অপরাধে ড কুশারী ডাইসন আমার মতো মানুষদের জন্য (অথবা শুধু আমারই জন্য?) সাত-আট পৃষ্ঠা জুড়ে 'মিশ্রতা' বিষয়েই আলোক দান করেছেন। জীবনের সর্বত্রই মিশ্রতা যে দোষ নয়, গুণ—এই তাঁর প্রতিপাদ্য। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে সবরকম সাংকর্য বা হাইব্রিডিজমেই আমার ঘোরতর আপত্তি এবং আমি সম্ভবত অবিমিশ্র শুদ্ধতার পূজা করে থাকি। হায় ঈশ্বর! হায় হায়, আমার যে ঈশ্বরও নেই।

প্রসঙ্গত নিজের সম্বন্ধে লেখিকা জানিয়েছেন: 'আমি তো সত্যিই প্রাদেশিক বা এক-সাংস্কৃতিক মানুষ নই, আমি তো সত্যিই আন্তর্জাতিক মানুষ—যে জন্য রবীন্দ্র-ভিকতোরিয়া-এলমহার্স্টের আন্ত-র্জাতিক কাহিনীটা বোঝা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে।'…'কবিতা লিখি বলে কি বিজ্ঞানে আগ্রহ নেই? "নিউ সায়েন্টিস্ট" পত্রিকাটার পাতা উল্টে থাকি, এবং এই পত্রিকায় কখনো সখনো আমার চিঠি পর্যন্ত বেরিয়েছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের মহিলা নৃতত্ত্ববিদদের একটি দল আমাকে ধরে বেঁধে তাঁদের সংস্থার সাম্মানিক সদস্য করেছেন।'…ইত্যাদি আরো অনেক কথা। এভাবেই তিনি লিখেছেন, 'হাইব্রি-ডিজম যে একটি মস্ত শক্তি, এই তত্ত্বটি আমি কত কাল আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে এবং পঞ্চাশের দশকের কলকাতার সাহিত্যিক আবহাওয়ায় আয়ত্ত করেছি।' …'ইংরেছি সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী-দের কাছে এসব কথা অতি পরিচিত, প্রায় 'ক্লিশে'। …অন্য কারুর কাছেও সে এগুলি 'ক্লিশে' মনে হতে পারে সে বিষয়ে কী করুণভাবে তিনি অসচেতন!

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ড. কুশারী ডাইসন যে আমিও 'রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেই আগ্রহী', তাঁর ভাষায় 'যারা প্রধানত রবীন্দ্রমধুলোভী' তাদেরই একজন আমি। 'আমার সাহিত্যিক বিবর্তনে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি মূলত রবীন্দ্র-কৌতূহলী'—লেখিকার এই অনুমানে কোনো ভুল নেই। তাঁর সাহিত্যিক বিবর্তনকে বোঝার কোনো তাগিদ নিয়ে যে আমি বই দুখানি আগাগোড়া পড়ি (এ বিষয়ে লেখিকা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অবশ্য) নি একথা কবুল না করে আমার উপায় নেই। তবু আমার মতো বেদরদি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পাঠকদের সমর্থনে বলি যে আমাদেরও তো সময়ের কিছু দাম আছে। আমার জানা মাত্র দু-একটি ভাষাতেই অদ্যাবধি যত মহৎ সৃষ্টি হয়েছে তার কতটুকু ভগ্নাংশই বা পড়ে ওঠার মতো সময় ও শক্তি আমার ছিল? এখন আমি জীবনের যে-পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে চিরকালীন ক্লাসিক সাহিত্যে মনোনিবেশক রাটাই সময় ও শক্তির সবচেয়ে সার্থক উপযোগ বলে মনে করি। কখনও-সখনও আধুনিক, এমনকি পরীক্ষামূলক রচনাও যে পড়ি না তা নয়। তবে সেই রচনা যদি প্রথম সাক্ষাতেই বিস্বাদ ঠেকে তাহলে সেই লেখকের বিবর্তন অনুধাবন করার অথবা তাঁর পরীক্ষামূলক আঙ্গিকের সার্থকতা বিচার করার আগ্রহও শূন্যে গিয়ে নামে। আমি নিরুপায়।

আবার কখনও উল্‌টোটাও হয়। ক'দিন আগেই ইগনাৎসিও সিলোনের একটি উপন্যাস, 'ব্রেড অ্যানড ওয়াইন', পড়ে এত ভালো লাগল যে তাঁর অন্য বইগুলির সন্ধান করছি। অথচ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের অনুষঙ্গে এই নামটির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল; আর এতকাল পরে এই প্রথম তাঁর একটি রচনা পড়লাম। এই লেখকের বিবর্তনও প্রায় আর্থার কোয়েসলার কিংবা জর্জ অরওয়েলের মতোই অনুধাবন-যোগ্য বলে আমি মনে করি। এবং এঁরা অনেক বেশি আমার আগ্রহের মানুষ। তবু এঁদের অনুধাবন করবার

মতো সময়ও কি আর আমার অবশিষ্ট আছে? একথা শুনেও ড. কুশারী ডাইসন আমাকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না। তবে কেন তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থ দুটি আমার মাথায় ঢোকে নি তা বুঝতে পেরে হয়তো কিছুটা শান্তি পাবেন।

সে যাক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ড. কুশারী ডাইসন লিখেছেন, 'এও আমি মানি নে যে, একটি আধুনিক প্রেমকাহিনীর স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়ার গল্পটা কালো হয়ে যেতে পারে।' ওখানেই তো জ্বালা। এবার আমি ছোট্ট করে একটা গল্প না বলে পারছি না। সম্প্রতি একটি বাংলাদেশী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে জাহাজের দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইনজিনীয়র। শ্রীমান কলকাতার এক কৃতী ও সুপরিচিত ডাক্তারের কন্যাকে ভালোবেসে মহাবিপদে পড়েছিল। কারণ কন্যার পিতা এই পাণিপ্রার্থী যুবককে তাঁর জামাতা হবার যোগ্য বলে মোটেই গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তবু তাঁর মন গলাবার আশায় তাঁর পায়ে ধরে অনুনয় করে যুবকটি বলেছিল যেন দুটি তরুণ জীবন তিনি ব্যর্থ করে না দেন। উত্তরে ওই ডাক্তার সাহেব তাকে পরম বিজ্ঞের মতো বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'অল্প বয়সে ঐরকম প্রেম সবারই বহুবার হয়। আমিও ঢের প্রেম করেছি। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড, এক হিন্দু মিনিস্টরের মেয়ে তো আমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে যখন করলুম তখন আব্বাজান যাকে পছন্দ করে দিলেন তাকেই করলুম। অসুখী তো হই নি।' শ্রীমান আমার কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল, 'তিনারে আমি কইতে পারি নাই যে আপনে যারে প্রেম কন আমি তারে প্রেম কই না।' আমারও ওইটুকুই বক্তব্য ছিল।

তবু হয়তো বিশদ করেই বলতে হবে। কারণ, কেন যে রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়ার কাহিনীর সমান্তরালে অশনি-অনামিকার ওই কাহিনীর পরিবেশনে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি তার কারণ লেখিকাকে যে বোঝাতে পারি নি এটা স্পষ্ট। 'আমাদের দুজনের মধ্যস্থ ইডিওলজিকাল ব্যবধানের' উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'ঐ নামী দুজনের গল্পটা সোনা আর অন্য দুজনের গল্পটা খাদ—আমার বই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ।' তুমুল প্রতিবাদটা একটু অস্থানে করেছেন। প্রেমিকের মূল্য নির্ণয় করতে বসে আকবর বাদশার, এমনকী শাহজাহান বাদশার সঙ্গেও, হরিপদ কেরানির ভেদ কল্পনা করব, প্রেমের ধারণায় এতটা স্থূল আমাকে নাই বা মনে করলেন।

তাঁর অন্য অনুমান যে, 'প্রেম-জীবনের অসামাজিকতাই যদি বিচারের নিকষ হয়, আমার চোখে, তাহলে আমি যেন একবার ভেবে দেখি কে বেশি 'খারাপ মেয়ে' (!) —ভিকতোরিয়া না অনামিকা। যেহেতু বাস্তবের ভিকতোরিয়া স্বামীর জীবৎকালেই কত অখ্যাত-বিখ্যাত জনের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছেন। তাঁর 'প্রেমজীবন সামাজিক নিয়মের ধার ধারে নি।' অন্যপক্ষে কাল্পনিক 'অনামিকা বিধবা, তার প্রেম অন্বেষণ অবৈধ নয়, সে একটি রাত একজনের সঙ্গে কাটিয়েছে' মাত্র। আবারও কপালে করাঘাত করতে ইচ্ছা করছে। তা না করে বরং স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করি যে, প্রেমজীবনের সামাজিকতা-অসামাজিকতা আমার কাছে কোনো প্রশ্নই নয়—বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে অসামাজিকতার অর্থ সমাজের কোনো অনুশাসন ভঙ্গ করা। কিন্তু অসামাজিকতার অর্থ যদি হয় অন্য মানুষের সুখ-দুঃখ ভালোমন্দ বিষয়ে নিষ্ঠুর অবহেলা, তা হলে আমি দ্বিতীয় বার ভেবে দেখে আমার মতামত ব্যক্ত করব।

প্রেমের মহত্ত্ব কিংবা অকিঞ্চিৎকরতার নিকষ আমার কাছে, তার গভীরতা, তার সূক্ষ্মতা, তার প্রসাদগুণ। কোনো প্রেম মানুষকে বড়ো করে আর কোনো প্রেম যে মানুষের ক্ষুদ্রতাগুলিকেই চারিয়ে দেয়, এ তো কতজনের বেলাতেই দেখলাম কতবার। সব 'প্রেম' তুল্যমূল্য—এ আমার মনে হয় না। যে অনামিকা এতই অগভীর, নির্বোধ ও স্থূল যে

রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'বিদীর্ণ বিস্তীর্ণ বিরহের cult' অশনি (যার এককালে প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন শয্যাসঙ্গিনী লাগত) অন্তঃস্থ করে নিতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন নিজেকেও করতে পারে কিংবা 'কবিগুরুর মতন বিরহবেদনা মন্থন করে কবিতা লিখতে' চাওয়া অশনির পক্ষে সম্ভবপর কিনা সেটুকুও বুঝতে পারে না, সেই নায়িকার প্রেম যতই কেন অভিনব হোক না, আমার মনে তা শ্রদ্ধা জাগায় না। আর অশনির কথা নাই বললাম। অবশ্য তার রচয়িত্রী তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথসদৃশ সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। আমার 'খাটো দৃষ্টি' (ড. কুশারী ডাইসন শব্দ দুটিকে ভালো করে দাগিয়ে দেবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করেছেন—তাতে যদি আমার চোখ খোলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।) আমাকে বঞ্চিত করেছে। ওই মহৎ সম্ভাবনার আভাসমাত্র দেখতে দেয় নি।

যাক, অনামিকার প্রতিতুলনায় 'বেশি অসামাজিক' গোপন প্রেমে লিপ্ত ভিকতোরিয়া যখন ত্রিশ-উত্তীর্ণা হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হন (তার প্রচুর প্রমাণ ড. কুশারী ডাইসন তাঁর ইংরিজি বইটিতে দিয়েছেন) এবং পরিণত বয়সেও সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে লিখতে পারেন, 'মাঝে-মাঝে ইচ্ছা করত তাঁর ঘরের দরজার সামনে পোষা কুকুরটির মতো পড়ে থাকি—কিন্তু তা তো আর সত্যিই করা যায় না'—তখন 'প্রেম' শব্দটি অন্য এক উজ্জ্বল মাত্রা পায় আমার চোখে। কোন্ প্রেম 'সাচ্চা' আর কোন্টা 'ঝুটা' তার তাৎক্ষণিক বিচার হয়তো প্রেমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব নয়? এবং যুগান্তরের ব্যবধানে!

অশনি-অনামিকা প্রেমকাহিনীর সেই অংশটি আবার স্মরণ করাই: অশনির হোটেলে রাত্রিযাপন করার পর অনামিকাকে নিজের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য অশনির অশোভন ত্বরা অনামিকাকে ক্ষুব্ধ করেছিল বলে সে বেশ তীব্রভাষায় অনুযোগ জানিয়েছিল। যাই হোক, অশনি দায়সারাভাবে তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার পরে নিজের হোটেলে, কফি সামনে নিয়ে বসে প্রাতরাশের অপেক্ষা করছিল অনামিকা। রাত্রিশেষে বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে আর-একবার রতিক্রিয়ার ফলে তখনও তার অধোবাসে অস্বস্তিকর সিক্ততা অনুভব করছিল। তখন জানালার বাইরে বরফ পড়ছিল। অনামিকা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে আবৃত্তি করছিল:

I think
love is like that; merciful as snow
bandaging the bruised earth,
while making the green grow.

লেখিকার মতে এই 'bruised earth' শব্দ দুটিতে 'পৃথিবীর বিক্ষত অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে, আর যে মানবিক ক্ষতিবোধের ইঙ্গিত অভিপ্রেত তা নায়িকার অকালবৈধব্যের।' কিন্তু নায়িকার অকালবৈধব্যের ক্ষত তখন এতটাই মিলিয়ে গিয়েছে যে অপর একটি পুরুষের সঙ্গলাভ বিষয়ে কোনো মানসিক প্রতিরোধ তো সে বোধ করেই নি, বরং আকর্ষণই অনুভব করেছিল। এই সঙ্গসুখ লাভের পরে ঘুম থেকে উঠে আবার এই পুরুষটির সঙ্গেই তীব্র মান-অভিমানের কথাও কিছুটা হয়েছিল। তাই লেখিকার অভিপ্রায় যাই থাকুক, সেই মুহূর্তে 'bruised earth'-এর সঙ্গে অনামিকার অতি সাম্প্রতিক হৃদয়-বেদনার কোনো সম্পর্ক অনুমান করা পাঠকের পক্ষে খুব কি অনুচিত হবে? তবু এ নিয়ে আমি তর্ক করব না, লেখিকার মতই মেনে নিলাম। কিন্তু এখানে 'love' শব্দটির ব্যবহারে আমি যে আপত্তিটুকু জানিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করছি না।

আমি আমার সমালোচনায় লিখেছিলাম: 'এখানে আর একবার সেই too often profaned শব্দটির ব্যবহারে আমার সেকেলে মন হায় হায় করে উঠল।' নিজেকে এই প্রসঙ্গে 'সেকেলে' বলে

কবুল করেছিলাম শুধু প্রেমের চরিত্র বিষয়ে আমার একটু পুরানোপন্থী ধারণা ব্যক্ত করার জন্য। কিন্তু দেখে পুলকিত হলাম যে এর ফলেই ড. কুশারী ডাইসন আমাকে এতদূর সেকেলে ধরে নিয়েছেন যে সম্ভবত আমি জাতপাত মানি, অন্ত্যজের হাতে জল খাই না, গোমাংস খাই না ইত্যাদি ইত্যাদি। অগত্যা এইসব ব্যাপারে তাঁর নিজের উদারতা ঘোষণা করাটা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে তাঁর।

আমার প্রত্যুত্তরের দৈর্ঘ্য বেড়ে চলেছে। কিন্তু সত্যিই এই আলোচনায় কোনো লাভ আছে কিনা এ প্রশ্ন বারে-বারেই মনে হচ্ছে। কারণ এজাতীয় বিতর্কে প্রায়ই প্রতিপক্ষের হীনতা প্রমাণ করতেই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। ড. কুশারী ডাইসনও আমাকে অব্যাহতি দেন নি। তাঁর ইংরিজি বইটির প্রসঙ্গে লিখেছেন, '৪৭৭ পৃষ্ঠার এই একাডেমিক বইটাতে আমার অনেক পরিশ্রমের ফসলকে তার ন্যায্য পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পাঠক আদেখলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন একটি মাত্র পৃষ্ঠার উপরে, লুব্ধ শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মণ্ডামিঠায়ের উপরে। আমি স্তম্ভিত যে মাননীয়া গৌরী আইয়ুবও এই কাজটি করেছেন। বস্তুত কেবল একটি ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতেই তাঁর সুরুচিবোধের তাড়নায় (বা যাঁরা তাঁর সুরুচিবোধের শরিক তাঁদের প্ররোচনায়) কলম ধরেছেন, নয়তো বৃহদায়তন বইটাতে আলোচিত আর কোনো ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনো মতামত নেই।'

অভিযোগটা যথার্থ নয় একথা বলতেও লজ্জা বোধ করছি। তাঁর এই গ্রন্থখানির যে অংশগুলি আমার উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল, সে বিষয়ে ৪৬ পৃষ্ঠায় লেখার পর আমার আপত্তি আড়াই পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম। আমার সমালোচনা-প্রবন্ধটি চতুরঙ্গ পত্রিকার দুই সংখ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলেও মুখবন্ধের মন্তব্যগুলি যে বাঙলা বইটির জন্য তত নয়, এবং ইংরিজি বইটির জন্যই প্রধানত, একথাটা প্রথমেই আমার স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ, ভিকতোরিয়া ও এলমহার্স্টে'র চিঠিপত্রগুলি খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁদের পারস্পরিক প্রীতি, উচ্ছ্বাস অভিমান অভিযোগ, প্রায় কিশোরদের মতন ভুল বোঝাবুঝি, মানভঞ্জন অবশেষে স্থায়ী সৌহার্দ্য···এই সবকিছুর সরস বর্ণনা দিয়ে দু মাসে গড়ে ওঠা ত্রয়ী বন্ধুত্বের কাহিনীটা এমন সুন্দর করে বলতে পেরেছেন বলেই তাঁকে একাধারে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এবং কৃতী সাহিত্যিক বলেছিলাম। কোনো-কোনো ঘটনার বর্ণনা ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় তিনি সুরুচি, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন সত্যিই। কিন্তু ঐ মর্মে তাঁকে যে প্রশংসা করেছিলাম সেই প্রশংসাকে তিনি অকপট মনে করতে পারেন নি যেহেতু তাঁর বাঙলা বইয়ের প্রেমকাহিনীটিকে আমি একেবারেই প্রশংসা করতে পারি নি।

এই বিদুষী বহুভাষাবিদ মহিলা সম্বন্ধে প্রশংসা-সূচক যা কিছু বলেছিলাম তার প্রায় সবটাই তাঁর ইংরিজি বইটি পাঠের প্রতিক্রিয়া—একথাও যে তাঁর ভালো লাগবে না তা আমি বুঝতে পারছি। বাঙলা উপন্যাসটি তো তাঁর এমন সৃজনকর্ম যাতে তাঁর নিজের সত্তাকেও কিছুটা প্রক্ষেপ করেছেন। অথচ তাঁকে আমি সংবেদী বলেছিলাম এইজন্য যে ভিকতোরিয়ার সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরদার চিঠিগুলি এবং কিছুটা জটিল আচরণের সবটুকু প্রেক্ষিত এবং বহুতল অর্থ স্পষ্ট করে তুলে ধরবার ব্যাপারে তিনি যথার্থই অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু ইংরিজি বই থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতিসহ তখন যে লিখিনি তার কারণ বাঙলা প্রবন্ধ ইংরিজি-উদ্ধৃতি-ভারাক্রান্ত হলে প্রেস ও পাঠকের বিরক্তি সৃষ্টি করে প্রায়ই। কিন্তু আমার আসল দোষ হয়েছিল এই কথা লেখায় যে ইংরিজি বইখানি পড়েও আমার অসাহিত্যিক কৌতূহল যতখানি চরিতার্থ হয়েছে আমার রবীন্দ্রসাহিত্যিক অনুভব সে পরিমাণে

গভীরতর বা সমৃদ্ধতর হয় নি। সত্যিই এটা আমার দুর্ভাগ্য যে *In Your Blossoming Flower Garden* পড়বার পরেও "পূরবী" কাব্যের উপলব্ধিতে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয় নি। এটা নিশ্চয়ই আমার সংবেদনহীনতার প্রমাণ।

ওই বিতর্কিত পৃষ্ঠাটি সম্বন্ধে আমার আপত্তি একটু বেশি জোর দিয়ে বলেছিলাম বলেই লেখিকার বলতে বাধে নি যে আমিও সব বাদ দিয়ে আদেখলে লুব্ধ শিশুর মতো ওই পৃষ্ঠাটির উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তবু আমার আপত্তির কথাটাই আরো একবার বলব। লেখিকা এবার তাঁর উত্তরের গোড়ার দিকে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'কোনো কৃতী ব্যক্তির জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা সম্ভব নয়, কেননা জীবিত ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হয়।' কেন? এবং মৃত ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তাই বা রক্ষা করতে হবে না কেন? এখানেই আমার একটি মৌল প্রশ্ন, শুধু ড. কুশারী ডাইসনকেই নয়, সেইসব গবেষকদের কাছেই যাঁরা পরিচিত মানুষদের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করে থাকেন—সেইসব মানুষ কৃতী-অকৃতী যাই হোন না কেন? মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করার দায় বা প্রয়োজন কিছুই কি নেই উত্তরসূরিদের? মৃত ব্যক্তির দেহটিকেও তো উলঙ্গ করে পথের ধারে ফেলে রাখাকে আমরা অমানবিকতা বলে মনে করি। তার জীবনটা কি তার সত্তার প্রিয়তর অংশ নয়? সেই জীবনটাকে কি হাটের মাঝখানে টেনে এনে নির্বিচারে কাটাছেঁড়া করার নৈতিক অধিকার আমাদের আছে? বিশেষ করে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় সত্যিই সেই মানুষের জীবন ও কর্মকে বুঝে ওঠার পক্ষে এমন কিছু অপরিহার্য নয়? অথচ যে গোপনীয়তাকে রক্ষা করার জন্য জীবদ্দশায় সেই মানুষটি হয়তো তার সর্বস্বই দিতে পারত? মৃত্যুর পর যখন সে আত্মরক্ষা করতে সবচেয়ে অক্ষম—অতএব আমাদের সহৃদয় আশ্রয় যখন তার সব-চেয়ে বেশি প্রয়োজন—তখনই কি তার জীবনের উপর শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে?

কৃতী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল অসীম এবং সেই কৌতূহলের সবটুকু চরিতার্থ করে যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে মূল্যবান কিছু সংযোজন হয়—সব সময় তাও নয়। 'উচ্চস্তরের গবেষণা'র নামে এজাতীয় মরণোত্তর উৎপাত আজকাল জলভাত হয়ে গিয়েছে। কে-ই বা এর থেকে অব্যাহতি পেতে পারে?

আমার এই আপত্তিকে এই গবেষকরা ব্রাহ্ম শুচিবায়ু, পিউরিটান শালীনতাবোধ, মরাল গার্জেনি ইত্যাদি অনেক কিছুই বলেছেন এবং বলবেন। আরো গালি মাথা পেতে নিয়েও বলব যে তাঁরা যতই বড়ো জ্ঞানান্বেষী হোন, কারুর ব্যক্তিগত জীবনকে অনাবৃত করার আগে একবার কি হৃদয় দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবেন না যে সেই মানুষটি বেঁচে থাকতে এ-জাতীয় পরিণতির কথা কল্পনা করলেও কতখানি আতঙ্কিত হতেন? কারবারটা যেহেতু অ্যামিবাকে নিয়ে নয়, সুখে-দুঃখে আত্মসম্মানবোধে গর্বে লজ্জায় ক্ষতবিক্ষত হৃদয়সম্পন্ন মানুষকে নিয়ে, তাই নির্মম অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সামান্য একটু সমানুভূতিও কি যুক্ত হওয়া উচিত নয়? An Allegory of Venus and Cupid দেখার অভিজ্ঞতা আর ভিকতোরিয়ার অপ্রকাশিত ডায়েরি পড়ার অভিজ্ঞতার জাত একই, এমনতর কথা যদি কেউ বলেন তাহলে আমি বলব হয় এই উক্তিতে ইনটেলেকচুয়াল ডিজঅনেস্টি আছে নয় জীবন ও শিল্পের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকে সেটি উপলব্ধি করবার ব্যাপারে মানসিক অসাড়তা আছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি এই কাহিনী লিখে যেতেন—যেমন "নষ্টনীড়" লিখেছিলেন—তাহলেই একে আমরা নান্দনিক অভিজ্ঞতায় পেতাম এবং পাবার অধিকারী হতাম। গান্ধীর *My Experiment with Truth* আত্মজীবনী বলেই মহৎ সৃষ্টি। স্বর্গীয়

নির্মলকুমার বসুর *My Days with Gandhi* সুলিখিত ও সত্যবাদী হলেও তার 'বৈজ্ঞানিক হৃদয়হীনতা' আমাকে একটু আহত করে। আমার শ্রদ্ধেয় এই লেখক যদি নিজের জীবন নিয়ে এরকম নির্মোহ সত্যভাষণ করতে পারতেন তাহলেই আমি তাঁকে যথার্থ সৎসাহসী লেখক বলতাম। নিজেকে যথেচ্ছ অনাবৃত করার অধিকার আমাদের সবারই আছে। অপরকে করার অধিকার নেই, বিশেষত মৃত্যুর পরে। আইনের বাধা না থাক, হৃদয়ের বাধা থাকা উচিত। কোনো ব্যক্তির (তিনি যদি সর্বজন-পরিচিত হন, তবে তো আরো বেশি করেই) স্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে তাঁর জীবনে উঁকি দিয়ে দেখা জীবদ্দশায় ঘটলে অভব্যতা, মরণের পরে তেমন আচরণ, তদুপরি হৃদয়হীনতা। ভিকতোরিয়া-রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন, আর সবার বেলাতেও তেমনি, 'যা ব্যক্তিগত তাই পবিত্র।' না কি মৃত্যুর পরে ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকতেই নেই, সবই এজমালি সম্পত্তি হয়ে যায়?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিকতোরিয়ার সম্পর্কটা কোন্ পক্ষ থেকে ঠিক কীরকম ছিল, রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে 'শুধুই আধ্যাত্মিক ছিল না অন্য কিছুরও মিশাল ছিল'—অর্থাৎ একটা 'সামগ্রিক আকর্ষণ' ছিল কিনা, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরেও সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাঁদের সম্বন্ধে যত অনুমান, যত কিংবদন্তী আগেও যেমন দু-দেশের হাওয়ায় উড়ত, এখনও তেমনি উড়তে থাকবে। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক জটিল-চরিত্র মানুষের পারস্পরিক মনোভাব ও ব্যক্তিগত প্রকাশ্য অথবা ঘনিষ্ঠ আচরণ তাঁরা নিজেরাই বা কতটুকু বুঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং পরস্পরকে যথাযথ বুঝিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? দুদিক থেকেই যতটুকু উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে এবং যা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়েছে তা অনুমান করে আমরা কি সব চরিত্রলক্ষণ মিলিয়ে শনাক্ত করে ফেলতে পারি যে সম্পর্কটা 'ঠিক এই-জাতীয়' এবং 'ঐ-জাতীয় নয়'? মানবিক সম্পর্কগুলির কি একই রকমের চেহারা থাকে সর্বত্র, সর্ব অবস্থায়? এখানে যা অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছিল তার স্পষ্টীকরণের চেষ্টাটাই আমার মূঢ়তা বলে মনে হয়।

তার উপর এখন তো দেখছি এটা প্রায় একটা জাতীয় মানসম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারিয়া রেনা কুরা এবং আরও বহু আর্জেনটিনীয়রা বলবেন, 'প্রেম থাকলে ছিল রবীন্দ্রনাথেরই, ওকাম্পোর নয়', আর আমরা বাঙালিরা বলব, 'বিদেশিনী বিজয়াই রবি-অনুরাগিণী ছিলেন, আমাদের ঋষিপ্রতিম কবির অনুরাগটা ছিল নিতান্তই কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক।' মনে হচ্ছে যেন যে পক্ষ ভালোবেসেছিল বলে প্রমাণ হয়ে যাবে সে পক্ষই একটা গোল খাবে। অর্থাৎ প্রায় নৈতিক পরাজয়। এই নিয়ে 'মূল্যবান' গবেষণা চলতে থাকুক। 'রাজা অশোকের কটা ছিল নাতী এবং বিন্দুসারের ক'টা ছিল হাতী' তার থেকে যে অনেক-অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হতে থাকবে সে কথা রজনীকান্ত সেনও অস্বীকার করতে পারতেন না। আমি তো কোন্ ছার!

ড. কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে আমার মৌলিক ওইডিওলজিকাল দূরত্ব যখন প্রমাণিত হয়েই গিয়েছে তখন তাঁর সুদীর্ঘ উত্তরে ছোটো বড়ো আরো বহু বিতর্কের বিষয় যে রয়েই গেল সেটা বলাই বাহুল্য। তবু এক জায়গায় ক্ষান্তি দিতে হয়। তবে তার আগে আর একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তিনি জানতে চেয়েছেন যে আমার কাছে 'প্রেমের শারীরিক প্রকাশ এবং টয়লেটে যাওয়া তা হলে সমগোত্রীয়?' এরও উত্তর দিতে হয়। না দিয়ে উপায় নেই বলে অগত্যা সংক্ষেপে বলি: কোনো-কোনো পরিস্থিতি আছে যে পরিস্থিতিতে অন্য কেউ আমাদের দেখুক এটা আমরা চাই না—যদি না অবশ্য আমরা প্রদর্শকামী বা exhibitionist হই। প্রিয়জনের, শ্রদ্ধেয়জনের এই না-চাওয়াটা অনুভব করতে পারা এবং তাকে মান্য করা কি তাঁদের উপর নৈতিক সর্দারি

করা? কিন্তু কোন্‌টা যে শ্রদ্ধা আর কোন্‌টা অশ্রদ্ধা, কোনটা সৌজন্য আর কোন্‌টা অসৌজন্য এই ব্যাপারেই যখন আমাদের যোজন-প্রমাণ মতভেদ তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কী? কেহ কারো ভাষা বোঝে না।

আমার শিয়রে সংক্রান্তি। আগামী কাল আবার কয়েক ঘণ্টা ধরে শল্য-চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, এবার তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তার পরেও যদি বেঁচেবর্তে থাকি তবু এই বিষয়টা নিয়ে আর ড. কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে নিষ্ফলা তর্ক করব না, সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করে ফেলেছি।

কেবিন নং ৬২৩
বোম্বাই হাসপাতাল
১৬. ১২. ৯১

গৌরী আইয়ুব

নাহি নাই নেই নি নে

'অব্যয়-শব্দ "নাই" আছে। ইহা তিন পুরুষেই প্রযুক্ত হয়। পুরাতন সাধু-ভাষার রচনায় ও কবিতায় "নাহি" এবং "নাহিক" রূপ পাওয়া যায়—ইহা "নাই"-এর পূর্ব রূপ। "নাই"-এর চলিত-ভাষার রূপ "নেই", এবং ক্রিয়ার পরে আসিলে চলিত-ভাষায় এই "ঽনেই" আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া "ঽনি" আকার ধারণ করে; যেমন—"সে আইসে নাই—(চলিত-ভাষায়) সে আসে নি; আমি করি নাই—(চলিত-ভাষায়) আমি করি নি"। এই "নাই, নি" অব্যয়-পদ, বর্তমান ক্রিয়ার পরে বসিয়া তাহাকে অতীতের ক্রিয়া করিয়া দেয়; যথা—"আমি দেখি নাই (দেখি নি), তুমি দেখ নাই (দেখ নি), সে দেখে নাই (দেখে নি)"। বর্তমান কাল জানাইবার জন্য "নাই"-এর স্থানে "না" অব্যয় বসে, এবং এই "না" চলিত-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি-হেতু "নে" রূপ গ্রহণ করে; যথা—"আমি দেখি না (>দেখি নে), তুমি দেখ না, সে দেখে না"; তুলনীয়: "আমি করি না, বা করি নে (=আমি সাধারণত করিয়া থাকি না—বর্তমানের ক্রিয়া)", এবং "আমি করি নাই, বা করি নি (=অতীতের ক্রিয়া)"।'

—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ:
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রূপা সংস্করণ, পৃ ৩৫৩।

রবীন্দ্ররচনায় প্রয়োগ:

কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁচেছে জানি নে (পায়ে চলার পথ, লিপিকা); ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি (বাণী, লিপিকা); ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি (সন্ধ্যা ও প্রভাত, লিপিকা); আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে (একটি চাউনি); আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে (সতেরো বছর, লিপিকা)।

নেতাজীবিষয়ক গবেষণার পীড়াদায়ক অপূর্ণতা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছু পরিমাণে আগ্রহ বোধ করেছিলাম এ বইটি "চতুরঙ্গ"-সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে সমালোচনার জন্য পেয়ে। বিষয়গৌরবের প্রতি গবেষকের (বিশেষত বাঙালি গবেষকের) সশ্রদ্ধ আকর্ষণের প্রত্যাশা সঙ্গতভাবেই করেছিলাম। নামজাদা প্রকাশক, ছাপা বাঁধাই, কাগজ, গ্রন্থসজ্জা সবই সুশোভন; অবশ্য কাঞ্চনমূল্য ভীতিপ্রদ। গবেষকের পরিশ্রম যে প্রচুর এবং অধ্যয়ন যে বহুবিস্তৃত তাতে সন্দেহ নেই; তথ্য-সূত্রের সমাবেশই এর সাক্ষ্য (যদিও একটু সংশয় থেকে যায় যে স্বদেশীয় রচনা বিষয়ে হয়তো গবেষকের অনীহা, সম্ভবত রচনাকালের অধিকাংশ বিদেশে কেটেছে বলে)। বেশ একটু প্রত্যাশা নিয়েই বইটি পড়তে চেষ্টা করেছি, কিন্তু না বলে পারি না যে সে প্রত্যাশা তুষ্ট হয় নি। হয়তো এজন্য দায়ী ইতিহাস-রচনা বিষয়ে (এবং সঙ্গে-সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁরই সমকালীন ১৯২৮-৪০-এর বিবরণ ব্যাপারে) আমারই মেজাজ ও মনোভঙ্গি। ইতিহাসকারকে অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠা এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিষয় সম্বন্ধে আক্ষরিক অর্থে না হলেও গভীর অর্থে নিরাসক্তির পরিচয় দিতে হবে। হয়তো এরই প্রয়াসে শ্রী চক্রবর্তীর সতর্কতা এই রচনাটিকে সীমিত ও শুষ্ক চেহারা দিয়েছে।

কিছুদিন আগে প্রখ্যাত তবলা-শিল্পী বন্ধু হীরু গাঙ্গুলির কাছে শোনা একটি কথায় চমকে উঠেছিলাম: 'শিল্পীর দোষগ্রাহী হবে না, গুণগ্রাহী হও!' বিদ্বান্‌দের সম্পর্কেও আমার সতত প্রযত্ন 'দোষগ্রাহী' না হয়ে 'গুণগ্রাহী' হওয়া। আলোচ্য গবেষণাগ্রন্থে সমাদর-যোগ্য বস্তু যে আছে, তা বলতে দ্বিধা নেই। 'Like a curate's egg, good only in parts'-ধরনের উন্নাসিক মন্তব্য একেবারেই অবশ্য করতে চাই না। কিন্তু গ্রন্থকারকে মোটামুটি তারিফ জানিয়েই আমার মনের অতুষ্টি গোপন করতে পারছি না। তিনি যদি গবেষণা এবং রচনার পরিধি পরিবর্তিত করে শুধুমাত্র সুভাষচন্দ্র নয়, সঙ্গে-সঙ্গে অন্তত কতকটা অনুরূপ জওয়াহরলাল নেহরুর মতো জাতীয়তাবাদী অথচ প্রাগ্রসর নেতারা শ্রেণীসমাজে কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা করতে গিয়েও কিভাবে 'দো-মনা' ('ambivalence') চেহারা না দেখিয়ে পারেন নি, তার বিশ্লেষণে নামতেন তো রচনার সার্থকতা বৃদ্ধি পেত।

সুভাষচন্দ্র যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন সেই 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসে (ডিসেমবর, ১৯২২) সভাপতির ভাষণে ব্যবহার করেছিলেন একটি বাক্য যা বিপুল প্রসিদ্ধি পায়—'Swaraj for the 98 per cent' ('শতকরা ৯৮ জনের জন্যই স্বরাজ')। সারা-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই তৎকালীন (১৯২০ সেপটেমবর) কংগ্রেস সভাপতি লালা লাজপৎ রায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, জওয়াহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ একই আসনে বসার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। নানা কারণে একটা খটকা অবশ্য থেকে যায়, এবং তখনকার সদ্যোত্থিত মজদুর-কিষাণ-সংগ্রামে জাতীয় মুক্তিপ্রয়াস সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে সহায় হতে পারে নি। মিলনের ক্ষেত্র অবশ্যই ছিল—নইলে প্রসঙ্গটিই উঠত না। কিন্তু বাধাবিঘ্ন ছিল প্রচুর। *Indian Business and Nationalist Politics* (Orient Longman, 1985) গ্রন্থে Claude Markovits-এর আলোচনা মনোগ্রাহী। ১৯৪২ সালের মে মাসে গান্ধীজী বুঝি লুই ফিশারকে বলেছিলেন যে মূলধন-মালিকদের কাছ থেকে কংগ্রেসের ভাণ্ডারে অর্থের অধিকাংশ আসে বলে থেকে যায় একটা 'অব্যক্ত ঋণ' ('silent debt')। তাদেরই অঙ্গুলিহেলনে কংগ্রেস চলত মনে করা অবশ্য কদর্থীকরণ, কিন্তু এটা ভুলে ভুলে যাবার নয়। 'দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে তৎকালীন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় টাটা কোম্পানি এবং দেশের শিল্পপতিরা কম সহায়তা পায় নি। আলোচ্য পুস্তকে জামশেদপুর শ্রমিক-সংগ্রাম বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু গভীরতাস্পর্শিতার চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

১৯২৭-২৮ নাগাদ সময়ে ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সুভাষচন্দ্র-জওয়াহরলালের 'কমিউনিজম্'-এর দিকে ঝোঁক নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে। শ্রী চক্রবর্তী কিছু-কিছু তথ্য একত্র করেছেন প্রাক্তন 'টেররিস্ট' এবং সদ্য জায়মান 'কমিউনিস্ট'-দের বিষয়ে, কিন্তু '*Ambivalence to the Working Class Struggle*'-শিরোনামায় একটি অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ একটু বেশি অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে। জওয়াহরলালের ক্ষেত্রে তার বিদেশী চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে থাকার যে অভিযোগ প্রচলিত ছিল তা সুভাষের সম্পর্কে প্রযোজ্য ছিল না। সেজন্যই যদি শ্রী চক্রবর্তী এদিকে বেশি মনোযোগ দিতেন তো ভালো হত।

কুণ্ঠা বোধ করছি, কিন্তু না বলেও পারি না যে সেদিনের বাঙলা কংগ্রেসে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু আধিপত্যের আলোচনা আরও অর্থবহ হলে খুশি হতাম। সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই তা সম্ভব ছিল। বীরেন শাসমল মহাশয়কে 'জাতের নামে বজ্জাতি' সহ্য করার ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল। ১৯২৩ সালের "বেঙ্গল প্যাক্ট্" নিয়ে দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক মৈত্রীবন্ধনকে সুদৃঢ় করার যে চেষ্টা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হওয়ার বিশ্লেষণও তৃপ্তি দেয় না। অগ্রজ শরৎচন্দ্র এ গ্রন্থে উপেক্ষিত (Leonard A. Gordon-কৃত *Brothers Against the Raj* সত্ত্বেও)। কিন্তু উভয় ভ্রাতা যে মাঝে-মাঝে মুসলমানের চিত্তজয় করেছেন (স্বয়ং জিন্না কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় খুশি হতে পেরেছিলেন) অথচ কখনও-কখনও 'Lala-Malaviya Gang' (মোতিলাল নেহরুর ভাষায়)-এর প্রভাবে পড়েছেন, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যার তাগিদ লেখক অনুভব করেন নি। 'Big Five' ("পঞ্চপ্রধান")-এর উল্লেখ আছে, প্রায় যেন রহস্যজনক ভাবেই। বাঙলা কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়া কিভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাকে প্রায় হাস্যাস্পদ করে তুলেছিল তারও উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্লেষণে অনেক ফাঁকি রয়েছে। ১৯২৮-৪০ হল গ্রন্থের আলোচ্য, অথচ বামপন্থী, সোশালিস্ট-কমিউনিস্ট ধারার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক আলোচিত হলেও প্রকৃত আলোকসঞ্চারী হয় নি। খুঁটিনাটি ধরতে গেলে অতিরিক্ত জায়গা লাগবে। কিন্তু ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে (যেখানে সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণে বহু অপূর্বকথিত বিষয় ও অন্তর্দৃষ্টির লক্ষণ ছিল) এবং এবং ত্রিপুরীতে (যেখানে প্রবল বিরোধিতার মোকাবিলা দরকার হয়েছিল) তার ভূমিকা গ্রন্থে প্রায় নেই। ১৯২৭ নাগাদ সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের 'মেয়র' নির্বাচনপর্বে অখ্যাত 'লিবারল' বি. কে. বসুর জয় এবং সুভাষের পরাজয়ের মতো ঘটনা অনুল্লিখিত। ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ইয়োরোপ-বাসকালীন সুভাষচন্দ্র পুরাতন কংগ্রেস নেতা ভিঠলভাই প্যাটল-এর স্নেহভাজন হয়ে একত্র প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাও যেন অতি তুচ্ছ। ১৯৩৮ নাগাদ সময়ে কংগ্রেসেরই ভিতরে বৈরী-ব্যূহ যখন সুভাষচন্দ্রকে বিপর্যস্ত করতে চলেছে, তখন স্বয়ং

Subhas Chandra Bose and Middle-class Radicalism : A Study in Indian Nationalism (1928-40)—By Bidyut Chakraborty. Delhi, Oxford University Press, 1990. Rs. 300

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "দেশনায়ক" বলে সম্বোধনদ্বারা যে সম্মান দেন, তারও উল্লেখ নেই। এই গ্রন্থে আলোচ্য কালের শেষ দিকে, শুধু হল্‌ওয়েল মনুমেন্ট উৎখাত করার আন্দোলন নয়, ১৯৩৯-৪০ সালে কমিউনিস্টদের সঙ্গে (মৌলিক মতভেদ সত্ত্বেও) একত্র সংগ্রামের যে আভাস দেখা দিয়েছিল, তা এখানে অনুক্ত। ১৯৪১ সালে দেশ থেকে অন্তর্ধানপর্বে যে কমিউনিস্ট সহযোগিতা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ছিল না, তা সম্ভবত গবেষকের অজ্ঞাত।

বহু মূলগত বিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে ভাবতে চেয়েছি বলেই এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা আমাকে পীড়িত করেছে। ১৯২৮-৪০-এর বিবরণে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ প্রতিকৃতি অঙ্কনের দায়িত্ব অবশ্য লেখকের ছিল না, কিন্তু শুধু গবেষণানিবদ্ধ ('thesis') নয়, গৌরবান্বিত এক ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে বিস্তৃত লেখাতে অন্তত সেই পূর্ণতার পরিচয় না দিতে পারা ঠিক নয়। অর্জুনের লক্ষ্যভেদকালীন একাগ্রতার যে সংকল্প নিয়ে সুভাষচন্দ্রের পরিক্রমা, তা ভুলে যাওয়া হয় কেমন করে? ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রধানত সুভাষ-শরৎ ইংরেজ সরকারকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'চরমপত্র' ('ultimatum') দিয়ে সংগ্রামঘোষণার যে প্রযত্নে লিপ্ত ছিলেন, তাকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতাগুণে সমালোচনা করলেও অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ করা যায় না। সুভাষজীবনের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এবংবিধ ঘটনা বোঝার চেষ্টাই বিহিত। কিন্তু সেদিকে শ্রীচক্রবর্তীর মনোযোগ এবং আগ্রহ আকৃষ্ট হয় নি বলে আমি ক্লিষ্ট।

সন্দেহ নেই যে গ্রন্থকার প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তথ্যসূত্র জানাবার চেষ্টা করেছেন অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে, যদিও তথ্য যাচাই করার কী পদ্ধতি নিয়েছেন তার ইঙ্গিত দেন নি (যা এ ক্ষেত্রে দরকার ছিল)। 'ব্যক্তি-পরিচিতি' বলে একটি অংশও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে এ যুগের পাঠকদের বিভ্রমই বাড়বে। বড়ো-বড়ো হরফে ভালো ছাপা বইয়ে এত 'প্রুফ'-দেখার (বা আরও মারাত্মক) ভুলই বা কেন? মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর নামের বানানে ভুল (তিনি জীবৎকালে এ বিষয়ে বেশ খুঁতখুঁতেই ছিলেন, সঙ্গত ভাবে)। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক-এর বেলাতেই তাই—এটা না থাকলেও চলতে কিন্তু বঙ্কিম মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির উল্লেখ মাত্র নেই। পরিচিতি প্রায়ই একান্তভাবে আংশিক ও বিভ্রমজনক। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্বন্ধে জানানো হয়েছে যে তিনি আই-এ (সেকালে কি F. A. না I. A. ছিল?) পরীক্ষায় ফেল করেন। ভালো কথা, কিন্তু মনে হয় পাশ-ফেল-এর ব্যাপারে গবেষকের একটু অদ্ভুত ধরনের কৌতূহল আছে। সুভাষচন্দ্র বিষয়ে এই গ্রন্থেই রয়েছে যে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। হয়তো তাই, তখনকার কালে তিনি সকলের আকাঙ্ক্ষিত 'আই-সি-এস্' পরীক্ষা দিতেই গিয়েছিলেন, কেমব্রিজে অধ্যয়ন ছিল উপরি ব্যবস্থা। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর শিক্ষাগর্ব না-ই থাকুক, সুভাষের লেখাপড়া নিয়ে এই অহেতুক ও অবান্তর উল্লেখকে যদি কেউ অল্পচেতা-সুলভ কটাক্ষ বলে তো দোষ দেওয়া যায় কি? এত কথা উঠত না যদি শ্রীচক্রবর্তী সঙ্গে-সঙ্গে জানাতেন যে সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে পরাজয় করে 'আই-সি-এস' পরীক্ষায় আর ইংরিজিতে ছিলেন প্রথম স্থানের অধিকারী। অতি তুচ্ছ একথা, কিন্তু এ যুগের উন্নাসিক ইতিহাসবিদ্‌দের সতর্ক হওয়া উচিত যাতে এমন ক্ষুদ্রতার পঙ্কে পা না পড়ে যায়। সুভাষ বিষয়ে বহু রচনায় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ও অপরিমিতি যতই হয়ে থাকুক, সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন নিশ্চয়ই চাই কিন্তু 'abundant hagiography' (গ্রন্থের প্রচ্ছদে এই বাক্যটি রয়েছে) ধরনের রচনাকে ভর্ৎসনা জানানো হয়েছে তার প্রতিকার এভাবের গবেষণার কর্ম নয়। ১৯২৮-৪০ সালের মধ্যে সুভাষ-চন্দ্রের চরিত্র ও কীর্তির প্রকৃত স্ফুরণ না ঘটলেও তখনকার বৃত্তান্ত অবলম্বন করে এর চেয়ে যথার্থ শিক্ষণীয় (এবং সঙ্গে-সঙ্গে উপাদেয়) গ্রন্থেরই প্রত্যাশা করেছিলাম।

ইতিহাসকে "পঞ্চম বেদ" অভিধা দেওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে ইতিহাস অবজ্ঞাত। এজন্যই শুধু যে ইতিহাসরচনাই বহুকাল রুদ্ধ থেকেছে তা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসবোধও হ্রাস পেয়েছে, চলমান জীবনে যে সনাতন ধ্যানধারণা সতত পরিবর্তনশীল, তা আমাদের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এজন্য বহু বিদ্বানের সাগ্রহ সযত্ন জ্ঞানান্বেষণ এবং পরম্পরাপীড়িত ভারতবর্ষে বিদ্যার প্রসারফলে জনপ্রবোধন-প্রয়াসের প্রয়োজন এত বেশি। আবার বলি এ জন্যই অধুনাতন গবেষকদের কাছে আমার প্রত্যাশার আধিক্য। প্রশস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকেও আলোচ্য গ্রন্থটির মূল্যায়নে অতি-কার্পণ্য করে বসলাম বলে মার্জনা চেয়ে রাখছি।

পরিশেষে 'চতুরঙ্গ'-পাঠকদের স্মরণ করাতে চাই বেশ কিছুকাল আগে পশ্চিম জগতের বিরাট ইতিহাসবেত্তা, রোমান ক্যাথলিক অথচ 'লিবারল', লর্ড অ্যাক্‌টন্-এর একটি কথা। তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাসকার হবেন না শুধু তথ্যসংগ্রাহক, তাঁকে হতে হবে সাহিত্যকার ('not the compiler of an encyclopaedia, but a man of letters')। নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে সর্ববিধ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের দায়িত্বের সঙ্গে-সঙ্গে এই উপরি দায়িত্বও তিনি ইতিহাসকারের উপর চাপিয়েছিলেন। এরই পাশে রাখতে চাই এদেশে সম্মানিত, মোটামুটি মামুলি ইতিহাসচিন্তায় অভ্যস্ত এবং অত্যন্ত সুলেখক 'লিবারল' ঐতিহাসিক G. M. Trevelyan-এর একটি মন্তব্য: 'Every true history must, by its human and vital presentation of events, force us to remember that the past was once real as the present and uncertain as the future. The events should be both written and read with intellectual passion. Truth itself will be the gainer, for those by whom history was enacted were, in their day, passionate'. এর অনুবাদ দুরূহ, তাই ভঙ্গ দিলাম। শুধু শেষ করি বলে যে অধুনা বহুকথিত 'conceptualization' ইত্যাদি বাক্যগরিমায় জড়িয়ে না পড়ে আমাদের সহজাত মানবমমতার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে সার্থক গবেষণা যেন হয়, সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তি, বহুবিতর্কিত হলেও দেশের মানুষ এবং ইতিহাস যাঁকে "নেতাজী" শিরোভূষণে মণ্ডিত করেছে, তাঁর প্রকৃত বহ্নিমান্ কীর্তির যথাসাধ্য নাগাল যেন দেশবাসী পায়!

বরাক উপত্যকার বাঙলা চর্চা

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মুখের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল বলে জ্বলে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। মাতৃ-ভাষার অমর্যাদা সইতে নারাজ সেই মানুষেরা বুকের রক্তে মাতৃভূমির মাটিকে ভিজিয়ে দিয়েছিল। আঠারো বছর প্রতীক্ষার পর মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে। "পূর্ব পাকিস্তান" নামটাই ইতিহাসের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে বাতিল হয়ে গেল। ভাষার ভিত্তিতে জন্ম নিল একটা দেশ, একটা রাষ্ট্র। একদিন ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হয়েছিল। এবারে ভাষার ভিত্তিতে নতুন আত্মপরিচয় খুঁজে পেল। ইতিহাস সাময়িক বিপর্যয়ের পাকদণ্ডী ছেড়ে যথার্থ পথে এসে দাঁড়াল। আমরা সীমান্তের এপার থেকে দেখলাম।

বরাকপারের গল্প—বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কাছাড় জিলা কমিটি। শিলচর, ১৯৯১। পঁচিশ টাকা।

খুশি হলাম। জয়ধ্বনি দিলাম। গর্ববোধও করলাম। কারণ যে-ভাষার ভিত্তিতে ইতিহাসের এত বড়ো ঘটনাটি ঘটল, সেটা আমাদেরও মুখের ভাষা, মাতৃ-ভাষা।

ফাঁকা গর্ববোধ করলাম। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করলাম না। সীমান্তের এপারে আমরা যারা একই ভাষায় কথা কই, তাদের আন্তরবন্ধনকে দৃঢ় করার কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিলাম না। একই ভাষায় কথা বলেন অথচ ভৌগোলিক ব্যবধানে বাস করেন, এমন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযাত্রিত্বের ভাব অনুভব করলাম না। বরং ভিতরে-ভিতরে ধর্মীয় বন্ধনের প্রতিই দুর্বলতা প্রকাশ করতে থাকলাম। দাঙ্গার সময় বা ভোটের বাক্সে তার প্রমাণও থেকে যাচ্ছে, এখনও। শুধু থেকে যাচ্ছে না, বাড়ছে। ইতিহাস একদিন বলবেই যে আজকের এই কালসীমায় আমরা ঠিক পথে চলি নি। যতটুকু এগিয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়েছি। ভাষার মর্যাদায় নিজেদের আত্মপরিচয়কে উজ্জ্বল করি নি, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় ইতিহাসকে বারে-বারে মসীলিপ্ত করেছি।

এমন কথা মাথায় এল শিলচর থেকে প্রকাশিত একটি অকিঞ্চিৎকর বাঙলা গল্পের সংকলন হাতে আসায়। 'অকিঞ্চিৎকর' বিশেষণটি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত যে-কোনো গল্পসংকলন কত ঝকঝকে ছাপা, চকচকে মলাট, সাজানো-গোছানো, অলংকৃত-সুবিন্যস্ত। সেই তুলনায় এই গল্পসংকলনটি অকিঞ্চিৎকর বইকি। প্রকাশ করেছেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জিলা কমিটি। মলাট ছাড়া বাকিটা ছাপা হয়েছে শিলচরেই। একুশজন গল্পলেখকের একুশটি গল্প। প্রায় সকলেরই জন্মসাল-সহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে ছবিসমেত। এসব গল্পলেখকের নাম কলকাতার বা পশ্চিমবাঙলার কেউ শুনেছেন কিনা সন্দেহ। শোনবার কোনো সহজ পথও নেই। দু-চারজনের এক-আধটা গল্প কলকাতার কোনো পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকতে পারে, তবে সে গল্প বা পত্রিকা কোনোটিই মনে রাখার মতো তেমন কিছু নয়। তবু সবাই গল্প লেখেন, অন্তত লেখার আন্তরিক চেষ্টা করেন। গল্প ছাড়া অন্যভাবেও সাহিত্য-চর্চা করেন কেউ-কেউ। সেসব কথাও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সূত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জানিয়ে দেবার প্রয়াসের মধ্যে কেমন যেন একটা দীনতার আভাস রয়ে গেছে। যদিও এ দীনতার জন্য এই গল্পলেখকরা বা এই গল্পসংকলনের প্রকাশকেরা ঠিক দায়ী নন। দায়ী শহর কলকাতার পরিশীলিত সমাজের নাগরিকেরাই। এই প্রচারমুখ্য নাগরিক সমাজের কাছে কিঞ্চিৎ স্বীকৃতির ব্যাকুলতাতেই তো এইভাবে আত্মপ্রচারের প্রয়াস।

কিন্তু তাতেও খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হয় না। "বরাকপারের গল্প" বরাক পার হবে বলে মনে হয় না। কারণ আমরা মুখে যাই বলি, একান্তভাবে মনে করি বাঙলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার যথার্থ অধিকার একমাত্র কলকাতা এবং পশ্চিমবাঙলারই আছে। এবং আমরা মনে রাখতে চাই না যে, সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র বরাক উপত্যকার শিলচর শহরেই ১৯৬১ সালের ১৯ মে এগারো জনের রক্ত ঝরেছিল বাঙলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য। বাঙলা ভাষার জন্যে রক্তে মাটি ভেজানোর ঘটনা ভারতবর্ষের বুকে আর কখনও ঘটে নি। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রক্ত ঝরানোতেই তাঁরা থেমে থাকেন নি। তারপর এই তিরিশ বছরে 'বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা' এই বরাক উপত্যকা মাতৃভাষার প্রতি তার দায়িত্বপালনে ব্রতচ্যুত হয় নি। ১৯৭৭ সাল থেকে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাটিগড়া আর খাসপুরে। মূলত এই সম্মেলনের সূত্রেই সেখানে গড়ে উঠেছে একটি সাহিত্য আন্দোলন, প্রকাশিত হয়ে আসছে অজস্র পত্রপত্রিকা, কবিতার বই, এবং সবশেষে এই গল্পসংকলন। এই সাহিত্যচর্চার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু এই আন্দোলনের ইতিহাস একদিন আমাদের গর্বের কারণ হবেই। তখন হয়তো এইসব অকিঞ্চিৎকর প্রকাশনা দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলে চিহ্নিত হবে।

দেশবিভাগের আগে বলা হত সুরমা উপত্যকা। তখনও তার ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ছিল। তারপর এল খণ্ডিত বরাক উপত্যকা। যে-অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল, তার ভাষার মর্যাদার লড়াই হল এক ধরনের, যার পরিণতি দেখা দিল বাংলাদেশের জন্মে। কিন্তু বরাক উপত্যকার লড়াই এখনও অব্যাহত। এ লড়াই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, এ লড়াই সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সুরমা উপত্যকার কাল থেকেই সে লড়াই চলছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে তার স্থায়ী সাফল্যও ইতিহাসে স্বীকৃতি পেয়েছে। চৈতন্যদেব থেকে সৈয়দ মুজতবা আলি (এই দুই প্রান্তিক নাম-চিহ্নে হয়তো অনেকের সমর্থন নাও থাকতে পারে) কোনো-না-কোনোভাবে সুরমা উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর বরাক উপত্যকা এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সত্ত্বেও যথার্থ মান রক্ষা যদি না করে থাকতে পারে, তার নিরিখে তার আন্তরিক নিষ্ঠার প্রতি ঔদাসীন্য দেখালে আমরাও ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষায় অক্ষম হব। একুশজন গল্প-লেখক যখন এক ভূগোলে এবং অল্পবিস্তর একই ইতিহাসে সীমায়িত, তখন তাঁদের গল্প-সংকলন নিঃসন্দেহে হয়ে ওঠে এক বিশেষ ভূগোল-ইতিহাসের দলিল। তবে একুশটি গল্প সামগ্রিকতার দাবি তো করতেই পারে না, প্রতিনিধিত্বের দাবিও করছে না। সংকলকেরাও তাঁদের সীমাবদ্ধতা জানেন, স্বীকারও করেন যে, 'এ গল্প-সংকলন বাছাই সংকলন নয়।' এ সংকলন 'স্বাধীনতার পর থেকে নব্বই-এর দর্শক পর্যন্ত কতিপয় গল্পকারের শুধুমাত্র কতিপয় গল্পের সমষ্টি।' একটি বিশেষ ভূমিতে অধিষ্ঠিত মানুষের পরিচয় পেতে গেলে এই কালসীমাটি খুবই জরুরি—১৯৫১ থেকে প্রতি দশ বছরের বিভাগে চারটি এবং ১৯৪৭ থেকে প্রথম চার বছরে একটি—এই পাঁচ ভাগে গল্পকারদের ভাগ করা হয়েছে। ফলে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠা, সীমান্ত-সমস্যা, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির খবর এবং তার প্রতিরোধ, বিভ্রান্ত যুবশক্তি, মধ্যবিত্তের আত্মরক্ষার সমস্যা, দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের সংঘাত—অনেক কিছুই বিভিন্ন গল্পের সূত্রে দলিলবদ্ধ হয়েছে। এবং সেইটুকুই এই সংকলনের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড়ো লাভ। সেইখানেই এই সংকলন একটি অঞ্চলের আন্দোলনের প্রতিনিধি। এখানে ব্যক্তিজীবনের প্রেম-বিরহের তেমন প্রশ্রয় নেই। এজন্য গল্পলেখকদের ধন্যবাদ। তবে সংকলকদের কাছে একটি অনুযোগ। তাঁরা যদি ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প এ সংকলনে রাখতেন। যদি না পেয়ে থাকেন অর্থাৎ যদি সেই প্রেক্ষাপটে কোনো সার্থক গল্প না লেখা হয়ে থাকে বরাক উপত্যকায়, তাহলে অনুযোগ গল্পলেখকদের কাছে, সংকলকদের কাছে নয়।

একুশটি গল্পের আলোচনা সম্ভব নয়, সবকটি গল্প আলোচ্যও নয়। নানা হাতে নানা মেজাজের গল্প আছে। দুজন গল্পকার প্রয়াত। অন্ততপক্ষে সাতজন পঞ্চাশোর্ধ্ব। সর্বকনিষ্ঠ গল্পলেখকের বয়স সবে তিরিশ পার হয়েছে। মহিলা আছেন দুজন। এই সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এটি বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তিটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে—এটি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্ভার। শুধু গল্প-লেখকের বিচারেই নয়, গল্পের কুশীলবে এবং সমাজ-পরিবেশেও হিন্দু এবং মুসলমান দুই সমাজের খবরই আছে, যা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙলা সাহিত্যে রীতিমতো অনুপস্থিত। কামালউদ্দিন আহমেদের "অকিঞ্চন" গল্পটিতে মুসলমান সমাজের সংস্কার যেভাবে একটি পরিবারে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘনিয়ে তুলেছিল, সেখানে ইমাম সাহেবের আশ্বাসবাণী

মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক বিপর্যয় এড়াতে মিথ্যা যে সত্যের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হতে পারে, গল্পের নায়ক জলীলের নির্বাক পশুর বোবা দৃষ্টি তার প্রমাণ। শুধু কি এক উত্তেজনার মুহূর্তে অনভিপ্রেত মুখফসকানো কথাতেই মানবিক সম্পর্কের সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে—এই প্রশ্নের কাছেই গল্পটি এক মহত্তর মাত্রায় এসে সমাপ্ত হয়ে যায়। এতিমালীরা কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়ে মেয়ের হাত ধরে সৈয়দপুরের মোকাম ছাড়িয়ে ডানহাতে যে শিলডুবি গ্রাম, সেই গ্রাম ছেড়ে লায়লাপুরে চলে আসতে বাধ্য হয়, আর জেল থেকে বেরিয়ে এসেই জসিম কেনই বা কসম খায় যে 'এই অন্যায়ের প্রতিকার করার মতো শক্তি যেদিন সঞ্চয় করতে পারবে সেদিনই শুধু সে দেশের মাটিতে পা রাখবে', তারই এক বিষণ্ণ অথচ বিশদ বিবরণ আছে মহীউদ্দীনের "এতিমালীর ইতিকথা" গল্পে। অতুলরঞ্জন দেবের "অপারেশন" গল্প যে-কোনো সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ছোটোগল্পসংকলনে স্থান পেতে পারে। অথচ গল্পের মধ্যে কোথাও মামুলি সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ নেই। করিমগঞ্জ-শিলচর বাসে পাশের সীটে বসা এক গ্রামের মানুষ, পরনে ময়লা কুর্তা, লুঙ্গি, মুখে বিড়ি—নাম আক্রম আলি। সে যাত্রাপথে বাদশার মোকামে মোমবাতির প্যাকেট দেয় আবার বদরপুর ঘাটের শিবমন্দিরের প্রসাদও হাত পেতে নিলে এক পরিশীলিত চোখে হয়ে ওঠে সম্প্রদায়োর্ধ্ব এক পিতা, যার কন্যার অপারেশনে সামান্য সাহায্য করার জন্য নিজের কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে পাকা কথা বলতে একটু বিলম্ব করতে বাধে না। তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা"র ঐতিহ্যে এক নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছে। এ কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন গল্পের গঠনে বা ভাষার বাঁধুনিতে যে দুর্বলতা আছে তা স্বীকার করেই বলা হচ্ছে। এই সংকলনের গল্পে ভাষার পরিশীলন বা গঠনগত চাতুর্য প্রত্যাশিত নয়। বদরুজ্জমান চৌধুরির "জানোয়ার" গল্পটি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। গল্পের প্রথম অংশে এক অতিপরিচিত মামুলি শোষণ এবং দারিদ্র্যের কথা, কিন্তু গল্পটির অন্তিম পর্বে যে শ্লেষ এবং প্রতিহিংসার সহাবস্থানের চকিত উল্লেখ আছে তাতে গল্পটি গতানুগতিকতাকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে, যদিও ভাষার ক্ষেত্রে এ গল্পেও পরিশীলন অনুপস্থিত। দারিদ্র্যের প্রসঙ্গে সামাজিক দুর্নীতির ভূমিকা খুব সংযতভাবেই ব্যক্ত হয়েছে অপরেশ ভৌমিকের "গুলিয়া" গল্পে যেখানে এক ছাঁটাই নারী-কর্মী দিনমজুরির আশায় শহরে পৌঁছে ব্যর্থ হয়। গল্পের ধারাবাহিকতায় যদিও গল্পটি সেখানেই শেষ। কিন্তু আট বছরের মেয়ের একটি প্রশ্নে 'ইতনা আটা কাহাশে আইল' গল্পটিকে গরিবের নিছক দুঃখের ইতিবৃত্তে শেষ করে নি, একটু শিথিলভাবে হলেও সমাজের উপরতলার বাজার নিয়ন্ত্রণের সামনে একটু শিশুর প্রশ্নের জবাব, তার মা কেন, গল্পলেখকও যেন দিতে সাহস পান নি। সেই জবাব শিশুকেই 'টুকুন-টুকুন করে বুঝতে' হবে জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে—এটাই আজকের যথার্থ বাস্তব অবস্থা। গল্পের শেষে ব্যর্থ ছাঁটাই কর্মীর ক্রোধ বা ভেঙে পড়ার কথা থাকলে গল্পে চমক লাগত হয়তো, কিন্তু তা বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকত না। যার প্রমাণ আছে শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর "অক্টোপাস" গল্পে। গল্পটিতে দুর্নীতির একটি বাস্তব চিত্র থাকলেও উপসংহার অংশে একটা ছকে বাঁধা রোমানটিকতার ছোঁয়া গল্প-পাঠককে গল্প পড়ার সুখ দিলেও সমাজকে চিনতে খুব একটা সাহায্য করবে না। তরুণতর লেখক দেবব্রত চৌধুরীর "সাধভক্ষণ" গল্পে দারিদ্র্যের বর্ণনা প্রেমচন্দের গল্পকে মনে করিয়ে দেয়। শ্রাদ্ধের ভোজের উচ্ছিষ্টে সাধভক্ষণের ব্যবস্থায় গল্প-লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে। সংকলনে জয়া দেবের "রাতুল" একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প। আত্মহত্যার আড়ালে বধূহত্যার এমন কৌশলী গল্প কোনো পাকা হাতে পড়লে বাঙলা গল্পে একটি উত্তীর্ণ গল্প হয়ে উঠতে পারত। এ

সংকলনের অধিকাংশ গল্পে আছে দারিদ্র্যের নিদারুণ বর্ণনা আর সামাজিক দুর্নীতির ছবি। সেদিক দিয়েও সংকলনটি দলিলধর্মী।

সংকলনের সব-কিছুই যে বন্দনীয়, তা নয়। সংকলকের কাছ থেকে অনেক বেশি যত্ন প্রত্যাশিত ছিল। ছাপার ভুলও পাঠকের চোখকে পীড়িত করে। এবং কোনো-কোনো গল্পে অনাবশ্যক আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, মুখের ভাষায় আঞ্চলিকতার ছাপ থাকতেই পারে কিন্তু একটা সর্বপ্রান্তস্বীকৃত বাঙলা ভাষার প্রয়োগকে অকারণে বিপর্যস্ত করাও তো ঠিক নয়, বিশেষত গল্পের বিবৃতি অংশে। বরাক-পারের মানুষ এখনও একটি আন্দোলনের মাঝে রয়েছেন। তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মিতা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই কবে যে মাতৃভাষার অমর্যাদায় বলতে পারব, 'তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়নজলে ভাসি।'

লোকসংস্কৃতির দুটি শাখা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা

আজহারউদ্দীন খান্

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করি: 'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত, এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে। তাহা বিশেষরূপে সঙ্কীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়, তাহা কেবল জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য। সেখানে বাহিরের লেখক প্রবেশের অধিকার পায় না' (গ্রাম্য সাহিত্য : লোকসাহিত্য)। রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই সাহিত্যই লোকসাহিত্য। পৃথিবীতে যদি কোনো জাতির নিজস্ব কোনো সাহিত্য থাকে সেটি তার লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় সেই জাতির মানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আচার-বিচার তথা ক্রিয়াকলাপের যাবতীয় পরিচয়। লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা সেজন্য আমাদের জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু লোকসাহিত্যের চর্চা এবং সংগ্রহ দুরূহ কাজ। সংগ্রহের কাজে একদিকে যেমন চাই গভীর নিষ্ঠা আর শ্রম, তেমনি চাই বিপুল জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে চাই গভীর ভালোবাসা। গ্রামের যে মানুষটির কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা হচ্ছে, সে যেন কোনো সময়ই না বুঝতে পারে আপনি তাকে কৃতার্থ করছেন; বরং আপনার ব্যবহার এমন হবে যে আপনি কৃতার্থ হচ্ছেন। নাগরিকতা উন্নাসিকতা যেন আচরণে কোনোরকমে প্রকাশ না পায়—গান্ধীজীর কথায় আপনাকে যেতে হবে তার মতো হয়ে, আপনার নিজের মতো করে নয়। এ ছাড়া, তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া-আসা বাবদ বেশ আর্থিক সামর্থ্যও থাকা চাই। এই লোকসাহিত্য বহুকাল ধরে বিনা বাধায় চলে এসেছে। কিন্তু ইংরেজ আগমনের পর থেকেই জটিলতা দেখা দেয়। বিদেশী শাসনে গ্রামীণ অর্থনীতি ধসে গেলেও, জীবনযাত্রা আর মানসিক পরিবেশ পরিবর্তিত হলেও এই সাহিত্য তখনও তার ঐতিহ্য হারায় নি। লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় বিপদ দেখা দিল অন্যদিক দিয়ে। প্রধানত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক শহুরে মানুষের সঙ্গে দেশের ইংরেজি-না-জানা অগণিত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়—এক বিরাট অহংবোধের প্রাচীর গড়ে ওঠে, লোকসাহিত্যের প্রতি একটা

বাংলা দাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়—ড. শীলা বসাক। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। পঁচাত্তর টাকা।

পুজাপার্বণের উৎসকথা—পল্লব সেনগুপ্ত। ওই। চল্লিশ টাকা।

নাকসিটকানো মনোভাব ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। লোকসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় এরকম একটা বিপদের গন্ধ পেয়েই এই সাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজেই ছড়া সংগ্রহ করে সংরক্ষণের সূত্রপাত করেন। তখন দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে—দেশীয় ঐতিহ্য উদ্ধারের একটা প্রবল উৎসাহ চারদিকে দেখা দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এই স্বদেশী আন্দোলন, এবং এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে সেদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্যই দেশের ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন। এভাবে অনেক লুপ্তপ্রায় ছড়া প্রবাদ লোককাহিনী ধাঁধা ইত্যাদি উদ্ধারিত হয় এবং এগুলি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজও পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। শীলা বসাকের কাজও এরকম একটি গবেষণা-পত্র। প্রথম বাঙলাভাগকে কেন্দ্র করে দেশের জিনিস উদ্ধারের যে জোয়ার এসেছিল, বিভাগ রদ হবার পর অচিরেই সেই উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে। বিদেশে লোকজ সাহিত্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়াস দেখে দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ মানুষরা নানা সভাসমিতি-পত্রপত্রিকার মারফত দেশবাসীর কাছে লোকসাহিত্য সংরক্ষণের জন্য এবং বিদেশী লোকসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ থেকে প্রেরণা নিয়ে দেশীয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনামূলক গ্রন্থ প্রণয়ণের জন্য আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। এই আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে বিশেষ করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্র আশুতোষ ভট্টাচার্য গবেষণা ও সংগ্রহের কাজ শুরু করেন এবং খণ্ডে-খণ্ডে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হবার পর লোক-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আবার পুরোদমে শুরু হয়, তবে এ-বঙ্গ থেকে ও-বঙ্গেই উদ্ধার-সংরক্ষণ-গবেষণার কাজ বেশি চলতে থাকে। ওপার বাঙলায় লোক-সাহিত্য নিয়ে যে বিপুলপরিমাণ কাজ হয়েছে, তার সিকি পরিমাণ এপার-বাঙলায় হয় নি। প্রতি জেলা, উপজেলা, এমনকী গ্রামকে নিয়ে সমীক্ষা হয়েছে—লোককাহিনী, লোকনাট্য, পালাগান, জারিগান, ভাটিয়ালি গান, মুর্শিদাগান, বাউলগান, মরমি সংগীত, মেয়েলিগীত, কিংবদন্তী, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধা ইত্যাদি নিয়ে কী না কাজ হয়েছে। এ কাজ শুধু-শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই হয় নি। এর পিছনে সরকার, বাংলা একাডেমী এবং ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়েছে। ওপার-বাঙলার কাজের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখেই এপার-বাঙলায় লোক-সাহিত্য সম্পর্ক ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হয়েছে। কোনো-কোনো বিশ্ববিদ্যালয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলাদা বিভাগও খুলেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য ছাড়া এপারে ড. সুশীলকুমার দে, ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সনৎকুমার মিত্র, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রমুখের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে শীলা বসাক কাজটি করেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন। সাফল্য বলতে পি. এইচ.ডি প্রাপ্তির কথা বলছি না, সাফল্য বলতে বোঝাতে চাইছি এরকম একটি কাজের দরকার ছিল। ধাঁধা নিয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিকের পর আর কেউ তেমন ব্যাপক অনুসন্ধানপূর্বক গবেষণা করেন নি। শীলা বসাক মহিলা হয়েও যতটুকু করা সম্ভবপর এপার ওপার বাঙলার দূরদূরান্তে গিয়ে ধাঁধা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর এই প্রয়াসকে অতি অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হয়।

লোকসাহিত্যের একটি শাখার নাম ধাঁধা। এই ধাঁধা শব্দটির বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম—যেমন, হেঁয়ালি, ভাঙানি, ফাকাল, ছিলকা,

ফড়ুই, ডাক ইত্যাদি আরও অনেক নাম। ধাঁধার সংস্কৃত শব্দ প্রহেলিকা। ধাঁধার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নেই। যে-কোনো বিষয় নিয়ে ধাঁধা তৈরি হতে পারে। পল্লীবাঙলার জনসাধারণের কাছে এটি একটি মজার খেলা, এবং এর রচয়িতাও তারাই, তারাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আনন্দ পায়। ধাঁধার একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট উত্তর থাকে। এই ধাঁধা তৈরি করার মধ্যে মানুষের একটা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা আর মনোবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আজকাল শহরে আই-কিউ কিংবা ক্যুইজ খেলা যেমন জনপ্রিয়, গ্রামে তেমনি ধাঁধা। ধাঁধা সাধারণত ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে তৈরি হয়—তার মধ্যে ভাব আর চিত্র নিহিত থাকলেও, বুদ্ধির সাহায্যে সেই গিঁঠ খোলাই হচ্ছে মজার ব্যাপার। সেজন্য ধাঁধা জ্ঞান আর শিল্পকর্মের সমন্বয়ে গঠিত।

ধাঁধা কত কালের প্রাচীন, তা সঠিক করে বলা শক্ত; তবে মানুষের আদিম সভ্যতা থেকেই যে চলে আসছে সে সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত। ব্লুমফিল্ড কাল-নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, 'From the olden times as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddles.' সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার দরুন ব্লুমফিল্ডের মতে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ধাঁধারও পরিবর্তন হয়েছে, ধাঁধা-গুলিও সভ্যতার সঙ্গে জটিল, জটিলতর হতে থেকেছে। এনড্রিউল্যাংও তাই বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতেও 'ধাঁধা বা হিঁয়ালী' প্রাচীন জগতের সৃষ্টি। তিনি বলেছেন, 'ঋগবেদে হিঁয়ালী আছে, গ্রীক সাহিত্যে ইডিপাসের উপাখ্যানে স্ফিংক্সের সমস্যার বৃত্তান্ত আছে। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে হিঁয়ালী আছে।' হোমার ও সফোক্লিসের কাব্যনাটকে, বাইবেল, আরব্যউপন্যাস, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, চর্যাপদ, নাথসাহিত্য, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, গোরক্ষবিজয়, হাতেমতাই প্রভৃতি পুঁথিতে অনেক ধাঁধা আছে। ধাঁধা মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়, উপস্থিত বুদ্ধির পরীক্ষা হয়, এজন্য কেউ-কেউ একে একপ্রকার ভার্বাল পাজল্ বলে বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য বইটিতে ধাঁধার ইতিহাস, বিভিন্ন দেশে ধাঁধার নাম, তার গঠনপ্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্য এবং ধাঁধার সঙ্গে ছড়ার ও ছড়ার সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য কোথায়—এইসব বিষয় বেশ ভালো-ভাবে বোঝানো হয়েছে। বাঙলা ধাঁধার ছন্দ আর অলঙ্কারের কথাও বলেছেন। বাঙলা ধাঁধার বিষয়-বৈচিত্র্য যে কত প্রকারের হতে পারে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। রোন্সালড ধাঁধাকে দু ভাগে ভাগ করেছিলেন—সাহিত্যিক ও লৌকিক। আশুতোষ ভট্টাচার্য সাহিত্যিক ধাঁধার মধ্যে আধ্যাত্মিক ধাঁধা নামে এক শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। লেখিকা এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ধাঁধাকে ভাগ করেছেন। সাহিত্যিক ধাঁধার উদাহরণ পূর্বপ্রদত্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। আধ্যাত্ম ধাঁধার উদাহরণ চর্যাপদ, নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মমূলক সাধনভজন আচার-আচরণ প্রসঙ্গ নিয়ে যে ধাঁধা, তাকেই আধ্যাত্মিক ধাঁধা বলা হয়। লৌকিক ধাঁধাকে বিষয়বস্তু অনুসারে আট ভাগে লেখিকা ভাগ করেছেন—যথা, নরনারী ও দেবদেবী বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ বিষয়ক, বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক, আখ্যান ও কাহিনীমূলক, গাণিতিক ও সংখ্যামূলক এবং বিবিধ বিষয়ক। এপার-ওপার বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব ধাঁধা লেখিকা সংগ্রহ করেছেন সেগুলিকে বিষয়ানুসারে ভাগ করে তিনি তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। একই ধাঁধা বিভিন্ন অঞ্চলে কী-ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, তাও উদাহরণসহযোগে দেখিয়েছেন। সমাজজীবনের সঙ্গে ধাঁধার সম্পর্কের কথা গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লেখিকা আলোচনা করে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ধাঁধার শুধু অতীত ও বর্তমান ইতিহাস দেন নি,

ধাঁধার ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে লেখিকা মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে তা পুরোপুরি বিজ্ঞান- ও প্রযুক্তিবিদ্যানির্ভর। রহস্যময়, অলৌকিক প্রভৃতি অবস্থা কাটিয়ে উঠে বিজ্ঞানের আনুকূল্যে মানুষ মনকে করেছে অনেকখানি যুক্তিনির্ভর ও বাস্তব-অনুভূত। কিন্তু মানবসভ্যতার মৌল বৈশিষ্ট্য একেবারেই লোপ পেয়েছে কি? যা-কিছু হেঁয়ালি, অস্পষ্টতা-রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন, তার প্রতি কৌতূহল মানুষের চিরকালের।···ধাঁধা বা হেঁয়ালি যেমন শিশুজীবনের পরম সম্পদ, তেমনি পরোক্ষে মানুষেরও বড়ো সম্পদ। কারণ শিশুত্ব মানুষের কোনোদিনই ঘোচে না। আর সেজন্যই ধাঁধার মৌল আবেদন অতীতে যা ছিল ভবিষ্যতেও তা থাকবে' (পৃ ৩২৬)। এরপরই শুরু হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই সমীক্ষায় লেখিকার ধৈর্য, অধ্যবসায় আর শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, নদীয়া, পশ্চিমদিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং বাংলাদেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, নোয়াখালি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, রঙপুর, পাবনা, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, সিলেট, সুনামগঞ্জ অঞ্চলের ধাঁধা তিনি সংগ্রহ করেছেন। এটি এই গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ নিঃসন্দেহে। কিন্তু এটুকুতেই যেন শেষ না হয়। বহু ধাঁধা, শুধু ধাঁধা নয়, লোকসাহিত্যের বহু উপকরণ এখনও সংগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছে। পি-এইচ.ডি. প্রাপ্তির পর লেখিকার উৎসাহ যেন নির্বাপিত না হয়—যা সাধারণত হয়ে থাকে। গ্রন্থের ভূমিকালেখক বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্যবিদ্ আশরাফ সিদ্দিকীও লেখিকার কাছে আবেদন রেখেছেন। অনুরূপ প্রত্যাশা লেখিকার কাছে আমাদেরও রইল। বর্তমান গ্রন্থে যা পেয়েছি সেই প্রাপ্তিযোগের আনন্দে এটুকু বলতে পারি যে, স্নিগ্ধ মনীষার সঙ্গে প্রজ্ঞার স্বাক্ষরের সম্মিলন এই গ্রন্থে রয়েছে। গবেষণা বলতে যেসব ভালো গুণের কথা মনে আসে লেখিকার মধ্যে তার সবগুণই বর্তমান অর্থাৎ তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে রসবোধ। বইটি পড়লে তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হতে হয়। One who gives love gets love—যিনি ভালোবাসেন তিনি ভালোবাসা পেয়ে থাকেন। বিষয়কে ভালোবেসে তিনি কাজ করেছেন আর সেই ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিয়েছেন। তাই আমাদের কাছ থেকেও ভালোবাসা তাঁর প্রাপ্য।

লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান শাখা হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে-স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন-নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা ওগুলির কোনও খবরই রাখেন না।·· নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।' পল্লব সেনগুপ্ত "পূজা-পার্বণের উৎসকথা" গ্রন্থে তারই পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে সামাজিক ইতিহাস। এই পর্বে লেখক পালপার্বণ প্রবর্তিত হবার আগে এবং কোন্ সময়ে আদিম সমাজের টোটেম ও ট্যাবু কী ভাবে পরিবর্তিত হয়ে সমাজব্যবস্থার ক্রম-বিকাশ ঘটিয়েছে তার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এই ইতিহাস থাকার ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে পূজাপার্বণের উৎসকথা যা বলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে পাঠকের সুবিধে হয়।

সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হওয়ায় পূর্বপুরুষদের মধ্যে জাদু আর অলৌকিক রহস্যের নানা ধরনের কাল্ট্ গড়ে উঠে। পরে সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হলেও ওই কাল্ট্ মানুষের রক্তের মধ্যেই রয়ে যায়। সেজন্যে আজকাল বহু বিজ্ঞানীকেও গ্রহ-শান্তির জন্য

আংটি কবচ পরতে দেখা যায়। গাছ, ফুল, পাতা, অরণ্য, নদী, বন, পাহাড়, জল, বাতাস, আগুন, চন্দ্র-সূর্য-তারা প্রভৃতির উপর অলৌকিকতা আরোপ করে পূজা-অর্চনা হতে থাকে। মৃত্যুর পর পরলোক আত্মা ইত্যাদি নিয়েও উৎসব-পার্বণ-ব্রত ইত্যাদি প্রচলিত হয়। জমির উৎপাদনশক্তির সঙ্গে মানুষের উৎপাদনশক্তিকে মিলিয়ে শস্য আর সন্তানকে একীকরণ করে যৌনপ্রতীকের পূজা শুরু হয়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ক্ষয়ক্ষতিকে মানুষ কিংবা পশুর প্রতিকৃতিকে দেবতারূপে কল্পনা করে পূজা করার রীতি চালু হল প্রাগৈতিহাসিক সমাজে। পূজা-অর্চনার দ্বারা প্রকৃতির সন্তুষ্টিবিধানকল্পে পশু ও নরবলিও চালু হয়ে গেল। এসব কথা লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে মনোরম ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পূজাপার্বণ কীভাবে ক্রমশ গোষ্ঠীগত থেকে ব্যক্তিবিশেষে রূপান্তরিত হতে থাকল, তার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যখন যেখানে যেমন ভাবে সমাজের কাঠামো গড়ে উঠেছে, তখন সেখানে ধর্মের ভিতর এবং বাইরের ধারণাগুলিও গড়ে তোলা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। কায়েমি শ্রেণীস্বার্থের অবিরাম প্রচারে ধর্মচেতনার উপরে যে দৈব-মহিমাই আরোপ করা হক না কেন, মূলত ধর্মের বিকাশ ঘটেছে একেবারে গোড়ায় অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ও ইন্দ্রজাল বা জাদুবিদ্যায় অন্ধ প্রত্যয় থেকে, আর পরবর্তী সময়ে সমাজপতিদের শ্রেণীগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচ্ছন্ন সূত্ররূপে' (পৃ ২১)। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সমাজবিশ্লেষণপদ্ধতি লেখক গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি যুগে শ্রেণীস্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখে ধর্মের বিকাশ আর সাধনপ্রণালী পরিবর্তিত হয়েছে। সমাজকাঠামো যেমন-যেমন বদলেছে, তারই আদলে মানসিকতার সঙ্গে দেবতা আর ধর্মের ব্যাখ্যাও বদলেছে। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে যেসব প্রতিস্পর্ধী শক্তি এসেছে, তার মোকাবিলা মাতব্বররা কী ভাবে করেছেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শক্তিকে মজবুত করার জন্য কী পন্থা নিয়েছিলেন, তারও আলোচনা লেখক করেছেন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করে পুরুষদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে সমাজব্যবস্থা তৈরি হল, তাতে ধর্ম ও সংস্কৃতি কেমন-কেমন বদলে গেল—তা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'সামাজিক জীবনে পুরুষের ভূমিকা তখন মুখ্যতর হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা সম্পর্কের চেতনা প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে পিতৃপরিচয়ের ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়েছে।···সমাজের শাসনব্যবস্থা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মাতৃকা দেবতার গুরুত্ব ভাবজগতে অব্যাহত থেকে গেল' (পৃ ৩১-৩২)। এরপর লেখক বাঙলা সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন 'বাঙালির সংস্কৃতির পূর্বসূত্র' অধ্যায়ে। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কী কী, তালিকা তিনি দিয়েছেন। বাঙলার লৌকিক দেবদেবী পূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে কী ভাবে সমন্বিত হয়ে গেল তার বিবরণ দিয়েছেন। এই সমন্বয়সাধনা শুধু ধর্মে নয়, পূজা-পার্বণেই নয়, সাহিত্যরীতির মধ্যেও কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেকথাও বলেছেন। বনবিবি, দক্ষিণরায়, ওলাবিবি, মানিকপীর, সত্যপীর এবং পীরের দরগায় হিন্দু-মুসলমানের শিন্নি দেওয়া মানত করা ইত্যাদি সাহিত্যসমন্বয়ের ইতিহাস। বাঙালি হিন্দু পরিবার ও মুসলমান পরিবারের মধ্যে ধর্মাচরণেও পরস্পরের রীতি-নীতি প্রবেশ করেছে। এই যোগাযোগ সমাজের ওপরতলা থেকে নীচুতলায় বেশি পরিমাণে হয়েছে, সেজন্য মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-কলহ হয় নি। লেখক এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ওপরতলার সংস্কৃতিতে মধ্যযুগে ততটা প্রতীয়মান না-হলেও, লোকায়ত পর্যায়ে ব্যাপকভাবেই ছিল, তা না-হলে এসব ভীতি-ও-বিশ্বাস এখনো টিকে থাকত না (পৃ'৪৮)। দ্বিতীয় পর্যায়ে পালপার্বণের উৎসকথা ঐতিহাসিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়েছে। সমাজের ওপরতলা এবং নীচুতলার নানা পার্বণের আচরিত রীতি-নীতি কী ভাবে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্তি হয়ে গেছে তার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে।

শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধাশীল চিত্তেই জ্ঞানের উদয় ঘটে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শ্রদ্ধা এবং অধ্যেষার সঙ্গে অনুভূতির সমন্বয়ে পল্লব সেনগুপ্তের গ্রন্থটি সার্থক এবং সফল। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণই তার প্রমাণ।

আজকের বাঙলা গল্প ও জীবনের তাপ-উত্তাপ

কামাল হোসেন

সব সময় মনে থাকে না, তাঁকে আমরা প্রাপ্য মর্যাদাও সবটুকু হয়তো দিতে পারি নি।

আমি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। আমরা সবাই জানি, তিনি ভালো কবিতা লেখেন। গল্পও লেখেন অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে। পত্রপত্রিকায় পড়েছি বেশ কিছু গল্প। কখনো গল্পের বিষয়বস্তু মনে দাগ কেটেছে, ভাবিয়েছে। আজকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনটি পাঠ করতে-করতে শরতের উদ্দেশে সত্যি-সত্যিই পৌঁছে দিতে ইচ্ছে করছে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার সোনালি স্পর্শ।

সমাজ, জীবন এবং মানুষকে দেখার ভঙ্গিমা শরতের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কিছুটা ভিন্নতর। অনেকখানি নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তিনি খুঁজে নিতে চান এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিষ। কখনো-কখনো চারপাশের এই বৈষম্য আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে স্পষ্ট তিক্ত ভাষায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। মাঝে-মাঝে বেশ তীব্র ঝাঁঝালো ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় তাঁর ক্রোধ এবং প্রতিবাদ।

বস্তিবাসী শিবশংকরের বুকে পেস-মেকার বসানোর সময় অযাচিত সাহায্যের হাত বাড়ায় গ্রাম থেকে আসা হনুমানপ্রসাদ। বস্তুত শিবশংকরের খুপরি ঘরখানার দখলদারি পাবার জন্য মজফফরপুরের হনুমানপ্রসাদের রীতিমতো প্ল্যানমাফিক অমানবিক কাজকর্ম আমাদের শিহরিত করে পৌঁছে দেয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষের বিচিত্র সংগ্রামমুখর উপত্যকায়।

"পানতুয়া" গল্পটিতে আছে উচ্চবর্গের মানুষদের প্রতি রীতিমতো শ্লেষ। "তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক" গল্পের পটভূমিকে ছাপিয়ে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের তীব্র ক্রোধ আর ব্যঙ্গের কশাঘাত।

বিধবা মেয়ে রেখাকে বিয়ে করেছিল অমিতাভ। মাঝে-মাঝে তার খটকা জাগে, কোথায় যেন একটা দুরূহ কাজ করে যায় তাদের সম্পর্কের মধ্যে। সবটা পেয়েও যেন পাওয়া যায় না: রেখার স্মৃতিতে কি এখনো বেঁচে আছে তার পূর্ব স্বামী? তবু যা পাওয়া যায়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার গল্প "অমিতাভ আপনাকে নিয়ে"।

দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন, সুখ-দুঃখ, সংকট—সব কিছু খুব সাবলীল ভঙ্গিতে এসে যায় শরতের গল্পে। "তন্বুকার আমি" গল্পে আমরা দেখি—বিবাহিত স্বামীর কাছেও একাকী স্নানঘরে স্নানরতা নগ্ন স্ত্রী কতখানি অপরিচিত মনে হয়।

নিছক স্ত্রী হিসাবে স্বামীর উপর আধিপত্য রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করে যায় মিতা। স্বামী সুব্রত অন্য নারী পাখির কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। এটাকে একটা চ্যালেনজ হিসেবে গ্রহণ করে অনেক ছলচাতুরী কসরত করে মিতা শেষ পর্যন্ত সুব্রতকে মদ খাওয়ার পথে ফিরিয়ে আনে। এটা তার কাছে রীতিমতো জয়ী হওয়ার মতো ঘটনা!

একজন মধ্যবয়স্ক বিবাহিত নায়কের পুরোনো প্রেমের সুগন্ধি খুঁজে বেড়ানোর বেদনামাখা গল্প "প্রয়োজন"।

অতীতকে স্পর্শ করার আর-একটি রুদ্ধশ্বাস গল্প "মচমচ শব্দ"। এখানে প্রৌঢ় নায়ক খুঁজে নিতে চেয়েছেন তাঁর হারানো শৈশব।

খালেদ চৌধুরীর অপূর্ব প্রচ্ছদের কোনো তুলনা নেই।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পাশের বাঙলার কথা-সাহিত্যের আঙিনায় একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর "চিলেকোঠার সেপাই" উপন্যাসটি যে-কোনো পাঠকের কাছেই এক মহৎ অভিজ্ঞতা। গত দশ বছরের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধ্রুপদী উপন্যাসটির পাশাপাশি দাঁড়ানোর মতো আর কোনো উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দুই বাঙলার কথা মনে রেখেই বলছি।

ছোটোগল্পের স্পর্শকাতর জগতেও আখতারুজ্জামান তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। "অন্য ঘরে অন্য স্বর", "খোঁয়ারি", "দুধভাতে উৎপাত" প্রভৃতি গল্পসংকলনে তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। "দোজখের ওম" সেই ধারার একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

আখতারুজ্জামানের ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, একই ক্যানভাসে নগর-স্থাপত্য এবং গ্রামীণ কুঁড়েঘরের যৌথ অবস্থান। নগর এখানে গ্রাম থেকে খুব বেশি দূরে দাঁড়িয়ে নেই, তবু কেন জানি না সমস্ত ঠিকানা মনে হয় অচেনা, মানুষের মুখগুলিও কেমন ভাঙাচোরা, কখনো-কখনো বড়ো একঘেয়ে দম-বন্ধ-করা পরিবেশে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। এ অপেক্ষা কোনো বড়ো ভাঙনের জন্য কিংবা কোনো মহৎ উত্তরণের জন্য—এরকম কোনো আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেন না এই শক্তিশালী লেখক।

"কীটনাশকের কীর্তি" গল্পে ঢাকা শহরে মস্ত বড়োলোকের বাড়িতে পরিচারকের কাজ করে কিশোর রমিজ। হঠাৎ একদিন সে চিঠিতে খবর পেল তার দিদি আসিমুন্নেসা কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুতরাং বাড়িতে টাকার দরকার। রমিজ হাজার চেষ্টা করেও তার মালিকের কাছে টাকা চাইতে পারে না। ঘটনাপরম্পরায় তার মধ্যে জন্ম নেয় যুগপৎ ক্ষোভ আর ক্রোধ। শেষ পর্যন্ত তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—সাহেবের তরুণী মেয়েকে কীটনাশক খাইয়ে দিলে হয়তো সাহেব কিছুটা অনুভব করতে পারবেন রমিজের দিদির আত্মহত্যার তাৎপর্য। বাস্তবে রমিজের ইচ্ছা-পূরণ অবশ্যই কার্যকর হয় না। বরং অনর্থক এক ছেলেমানুষি আক্রোশ প্রকাশের ফলে তার উপর চাপানো হয় ধর্ষকামীর মিথ্যে অপবাদ ও নিষ্ঠুর শাস্তি। বস্তুত, শব্দ আর প্রতীকের তীক্ষ্ণ প্রয়োগে আখতারুজ্জামান আমাদের পৌঁছে দেন এক চেনা অথচ বড়ো বেশি রকম নিষ্ঠুরতা- ও ঘৃণা-মাখা জগতে; তখন বাস্তবিকই অবাক হয়ে ভাবতে হয়, কী আশ্চর্য, এরকম ভাবেই চলছে তাহলে আমাদের সাজানো ঘর-সংসার! আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চিরস্থায়ী লীলাখেলা!

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প—প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। তিরিশ টাকা।

দোজখের ওম—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০। বাহান্ন টাকা।

মাটি - প্রণব দত্ত। পত্রলেখা, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। পনেরো টাকা।

মিশ্র রাগ—নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, বীণালয়, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। পনেরো টাকা।

নোনা জলের টান—চন্দন ঘোষ। সাহিত্যধারা, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, এ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। পনেরো টাকা।

কালো জল সাদা ফেনা—ফেরদৌস আরা আলীম। মধুর প্রকাশন, সেগুনবাগান, চট্টগ্রাম। পঞ্চাশ টাকা।

সম্প্রতির গল্প—এ মান্নাফ। প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, ৮বি কলেজ রো, কলকাতা ৯। পনেরো টাকা।

"দোজখের ওম" গল্পটি পড়তে-পড়তে আমি সত্যি-সত্যিই মাঝে-মাঝে শিউরে উঠেছি। বৃদ্ধ কামাল-উদ্দিন অসাড় শরীর নিয়ে নিত্যদিন দোজখের যন্ত্রণা সহ্য করেন। চোখের সামনে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড়ো বউমা উঠে এল শ্বশুরের ভিটেতে। বহুদিন আগে আকবর ভালোবেসে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এভাবে একের পর এক প্রিয়জনদের মৃত্যু এবং নিজের অসুস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু প্রার্থনার থাকে না। হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ জানতে পারলেন, তাঁর ছোটো ছেলে ঠিক করেছে বড়ো ভাইয়ের বউ আর ছেলে-মেয়েকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। এবং এখানেই আখতারুজ্জামান আমাদের পৌঁছে দিলেন জীবনের সেই ভয়ঙ্কর সন্ধিলগ্নে, যখন তীব্র শারীরিক আর সাংসারিক যন্ত্রণার মধ্যে ছটফট করতে-করতেও বৃদ্ধ অনুভব করলেন, বাড়ির মালিক হিসেবে তাঁর জীবিত থাকা আজ কতটা জরুরি। অনেক কাল পর "হানিফের মা ভাবী"কে দেখে বোধ হয় অতীতের কোনো নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে উঠে আসা উষ্ণতা তাঁকে ঘিরে ধরে। শাস্ত্র-নির্দেশিত দোজখ এখন তাঁর কাছে জীবনের-উত্তাপ-ভরা বেঁচে থাকার অমেয় উৎস। বিধবা বড়ো বউমা এবং তার সন্তানরা যাতে নিরাশ্রয় না হয়, তার জন্য তিনি নতুন করে ঘোষণা করেন বেঁচে থাকার সংকল্প। গল্পটি শেষ হয়েছে এইভাবে: 'বাঁচুম না ক্যালায়!' কামালউদ্দিনের এই বিড়বিড় ধ্বনি ভালো করে শোনবার জন্য হানিফের মা ভাবী মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। ছ্যাখে ডান হাতে ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে কামালউদ্দিন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারভীন চট করে এগিয়ে না ধরলে সে ঠিক পড়েই যেত। লাঠি এবং নাতনির ওপর ভাঙাচোরা শরীরের ভার রেখে ডান দিকের গতর ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে সে রওয়ানা হল নিজের ঘরের দিকে। ঠোঁট, জিভ আর গলার সচল, অচল ও নিশ্চল টুকরাগুলো জোড়াতালি দিয়ে কামালউদ্দিন একটি লালা-বলকানো হুঙ্কার ছাড়ে, 'তর চাচারে কইস, দাদায় অহন তরি বাঁইচা আছে।'

ঢালী আল মামুনের প্রচ্ছদ খুবই ইঙ্গিতধর্মী এবং যথাযথ।

"মাটি" গল্পসংকলনে প্রণব দত্তর দৃষ্টি নিবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের নানাবিধ অসঙ্গতি, সংকট আর আত্ম-প্রতারণার মধ্যে।

"কালো ঘড়ির কাঁটা" গল্পে পথিকের মেজদা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যায়। দিনের পর দিন থানা পুলিশ মর্গ ঘুরে ক্লান্ত পথিক হতাশ হয়ে বুঝি এক সময় কোনো অনিশ্চিত বিষণ্ণতার কাছেই আত্মসমর্পণ করে।

"ছিন্ন অলৌকিক" উঠতি ঘরের ছেলে আদিত্য এবং পড়তি ঘরের মেয়ে স্বাতীর দাম্পত্য জীবনের অদ্ভুত সংকটের গল্প। আদিত্য প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। সে তার ভয়ংকর চেহারার বুলডগকে দিয়ে "ডগ শো" করায়, পার্টিতে দেদার মদ খেয়ে মাতাল হয়। স্বাতী এসব মানতে পারে না দেখে মনে-মনে তার প্রতি অনুকম্পা বোধ করে আদিত্য। দৃশ্যপট পালটিয়ে যায়, যখন দেখা যায় স্বাতী নিজস্ব অধ্যবসায়ে বুলডগকে বশ করতে শিখে নিয়েছে, পার্টিতে উচ্ছল-ভাবে মদ্যপান করতে পারছে। বস্তুত স্বাতীর এ রকম 'উত্তরণে' আদিত্য এক ধরনের পরাজয় বোধ করে, হীনম্মন্যতায় ভোগে।

"ঘাসপাতা" এবং "প্রস্থানপর্ব" গল্প দুটি দুই প্রজন্মের ভিন্ন-ভিন্ন মূল্যবোধের সংঘাত ও আশা-নিরাশার মানবিক আবেগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

"মাটি" গল্পে সিঁধেল চোর কেলে তুলের মেয়ে পদ্ম তার নিরাপত্তা রক্ষার ভার নিজের হাতেই তুলে নেয়। প্রতিশোধ নেয়। অনেকটা রূপকথার ঢঙে ইচ্ছেপূরণের গল্প মনে হয়।

কৃষ্ণেন্দু চাকীর প্রচ্ছদ অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন।

সাম্প্রতিক কালে এ-বাঙলায় জীবনমুখী গল্প লেখার প্রবণতায় যে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম।

মোট তেরোটি গল্পের সংকলন "মিশ্ররাগ"-এ আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই এই সময়ের আত্মপীড়িত মানুষ ও তার সংগ্রামের গল্প। লেখকের উপলব্ধির গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। হয়তো কখনো-কখনো গল্পে আখ্যান অংশ বড়ো বেশি সরলীকরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তবু নিঃসংশয়ে বলা যায়, জীবনের কাছে দায়বদ্ধ এই লেখক তাঁর সামাজিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চান নি।

"তাদের মাটির গল্প", "নীল ছবি", "মিশ্ররাগ", "সোনালী বল", "প্রতিবিম্ব" প্রভৃতি গল্প পড়তে ভালো লাগে।

জীবনমুখী চিন্তাভাবনায় অন্বিষ্ট এই লেখকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকে যায়।

চন্দন ঘোষের গল্পের প্রধান সুর: এই সময়ের সমাজ-রাজনীতির ভয়ংকর জটিল ও ভঙ্গুর চালচিত্র। প্রধানত বামপন্থী চিন্তাভাবনার গল্পগুলি সহজেই আকৃষ্ট করে তাদের অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠ জীবনবোধের জন্য। এক ধরনের বিস্ময়কর সরলতা আমাদের পৌঁছে দেয় মানবিক হাহাকারের পোড়াজমিতে।

"ছবি" গল্পের নায়ক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আহত হয়। প্রকৃত কারণটি না জেনেই তার পরিচিত আত্মীয়পরিজন সবাই যে যার নিজের মতো ভুল বোঝে তাকে। চূড়ান্ত সামাজিক অবক্ষয়ের একটি নিষ্ঠুর দর্পণের মতো গল্পটি আমাদের মধ্যবিত্ত বিবেকবোধকে আক্রমণ করে।

১৯৭৭-এর পর এই বাঙলার শাসক দলের বিপ্লবী চরিত্রকে ব্যবহার করে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ লাভের ঘরে ফায়দা লুটছেন, কিংবা কেউ-কেউ স্বার্থশূন্য-ভাবে সংগ্রাম করে চলেছেন; সেইসব বিচিত্র আলো-আঁধারি চরিত্রগুলি নিয়ে চন্দন যেসব গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: "অন্য আলো ভালবাসা", "আপাতত শান্তি বিষময় হয়ে আছে", "ফ্রন্ট সরকারের অবস্থা ভবাইদার মতো" প্রভৃতি।

পাশের বাংলাদেশের ফেরদৌস আরা আলীমের গল্পের মূল বিষয় অবশ্যই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ। তার ছোটো-বড়ো পরাজয়। তার বেঁচে থাকা।

"কালো জল সাদা ফেনা" গল্পে বৃদ্ধা মা-এর মৃত্যু দুই বাঙলার যে-কোনো ধর্মের মানুষের জীবনেরই এক নিষ্ঠুর আলেখ্য।

কেন জানি না, বিভিন্ন লেখকের লেখা এইসব গল্পগ্রন্থগুলির বহু গল্পে চিত্রিত হয়েছে: এই সময়ের মধ্যবিত্ত বধূমাতাদের এক ধরনের নীচতা, স্বার্থপরতা, শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অদ্ভুত উদাসীনতা আর নিষ্ঠুরতা এবং একইসঙ্গে নিজের পিত্রালয়ের প্রতি বড়ো বেশি রকমের পক্ষপাতিত্ব। আমি অবশ্যই এর দ্বারা এই বিশেষ স্পর্শকাতর সামাজিক সমস্যার প্রতি কোনো সরলীকৃত মতামত স্থাপনে বিশ্বাসী নই। সবকিছুই নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক আর্থসামাজিক টানাপোড়েন, যুদ্ধপরবর্তী পরিবর্তিত পারিবারিক বিন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ ঘটনাপ্রবাহের ওপর।

"ফুলির কানফুল", "বাঁশি", "সন্তান" প্রভৃতি গল্প ভালো লাগে। তবে অতিরিক্ত চিত্রধর্মী বর্ণনা মাঝে-মাঝে গল্পের প্রবাহকে ব্যাহত করেছে।

খালিদ আহসানের চমৎকার প্রচ্ছদসহ সমগ্র বইটির প্রোডাকশন বাঙলা প্রকাশনার অহংকার বৃদ্ধি করে।

এ. মান্নাফের গল্পগুলির বিষয়বস্তু মহৎ: হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। তবে সম্প্রীতির অন্বেষণে গল্পগুলি পড়ে মনে হল, তিনি নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারছেন না, সম্প্রীতি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সাহিত্যের কিছু নিজস্ব শর্ত রয়েছে। আধুনিক বাঙলা ছোটোগল্পের রীতিপ্রকরণের সঙ্গে হয়তো তাঁর তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। সেজন্য অধিকাংশ গল্পই কতখানি সাহিত্যমূল্য পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে গেল।

১

দান্তের মূল্যায়ন

বাঙলার রেনেসাঁস ও রামমোহনের মূল্যায়ন বিতর্কে আমার একটি জবাবি লেখায় এঙ্গেলসের দু ছত্র উদ্ধৃতি এসে পড়েছিল ("চতুরঙ্গ", জুলাই '৯১)। তাতে এঙ্গেলস বলেছেন, 'প্রথম ধনতন্ত্রী দেশ ইতালি', এবং দান্তে 'মধ্যযুগের শেষ কবি ও আধুনিক যুগের প্রথম কবি।' সৈয়দ মুজতবা সিরাজ এঙ্গেলসকৃত দুটি সিদ্ধান্তকেই ভ্রান্ত বলেছেন ও দান্তে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন পেশ করেছেন ("চতুরঙ্গ", অক্টোবর '৯১)। পত্রটি থেকে আমার কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটলেও দুটি বিষয়েই আমার স্বতন্ত্র বক্তব্য আর মূল্যায়ন আছে। "চতুরঙ্গে"র পাঠকদের অবগতির জন্য তা বিনীতভাবে পেশ করছি।

মার্টিন ভন, স্পিংজ (Spitz), সম্বার্ট (Sombart), ডবসন (Dobbson), আন্তাল (Antal), মালহো (A. Malho) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও রেনেসাঁস-ভাষ্যকাররা যেভাবে আলোচনা ফেঁদেছেন, তাতে ইতালিতেই প্রথম বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল—এই মতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু ফল দেখে নয়, ফুল দেখেও গাছ চেনা যায়। এঁদের বক্তব্য—রেনেসাঁসের পুষ্পিত সংস্কৃতিটি সম্ভবই ছিল না ইতালির সমাজ এবং অর্থনীতির ভিত্তিগত স্তরে গুণগত পরিবর্তন সূচিত না হলে। রেনেসাঁসের সংস্কৃতিতে সামন্ততন্ত্র, পোপতন্ত্র, নোবলতন্ত্রের অনুপাত নিয়ে নানা কথা বলা যেতেই পারে, কিন্তু ভূমিনির্ভর পুরনো পৃথিবী থেকে তার অপসারণ যে ঘটেছিল—এ সত্য এড়াবার উপায় নেই। মরিস ডবসন অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'the money economy of the twelfth century to the sixteenth century as a merchant capitalism should not be confused with industrial capitalism'। ইতালির নাগরিক সমৃদ্ধির কড়ি শুধু কৃষি-সম্পত্তি থেকে আসে নি—তার সমৃদ্ধির প্রধান জোগানদার ছিল ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা আর বাণিজ্যতন্ত্র। বার্ডি (Bardi), পেরুজি (Peruzzi), মেদিচি (Medici)-দের ব্যাঙ্কিং ব্যবসা ছড়ানো ছিল গোটা ইউরোপ জুড়ে। ইতালীয় রেনেসাঁস পৃষ্ঠপোষকদের শিরোনামে মেদিচি পরিবার। তাদের অর্থাগমের প্রধান উৎস ছিল ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসা। আটলানটিক-দেশগুলি মাথা তোলবার আগে (১৪৯৮ খ্রী) ভূমধ্য-সাগর এলাকা বাণিজ্যিক দুনিয়ার মধ্যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। সেই বাণিজ্যলব্ধ মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ইতালির বিভিন্ন বন্দরে-নগরে। ভেনিসের বন্দরে পেতার্কা বিশ্ববিজয়ী বাণিজ্যতরণীর যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা এই রকম—'আমি ভাসমান জাহাজগুলিকে দেখতে পাচ্ছি। সেগুলি ভেনিসের বিশাল-বিশাল প্রাসাদের মতোই। জাহাজগুলি দুঃসাহসিক অভিযানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায়—ইংল্যানডে নিয়ে যায় মদ; রাশিয়ায় মধু; বস্ত্র, তেল প্রভৃতি নিয়ে যায় আসিরিয়া, আর্মেনিয়া, পারস্যে, আরবদেশে; মিশরে গ্রীসে নিয়ে যায় কাঠ, আর তারাই ফিরে আসে জাহাজভরতি বিভিন্ন বস্তুসম্ভার নিয়ে। আবার সেগুলি চালান দেয় পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে।' মার্কো দাতিনি (M. Datini), জিওভান্নি রুচেল্লি (R. Rucelli), অগাস্তিনো চিগি (A. Chigi), বা কোসিমো দ্য মেদিচির (Cosimo) মতো ইতালীয় বণিকদের কাণ্ডকারখানা আর সাফল্যের ইতিবৃত্ত যাঁদের জানা আছে, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন—শুধু সামন্ততন্ত্রী বা নোবল বলে এদের সম্পর্কে অর্ধেকেরও কম বলা হয়। কোসিমো তাঁর কার্যালয়ে নিক্তি ধরে যেতেন মার্কিন কোটিপতির মতো; চিগির শতাধিক বাণিজ্য-জাহাজ তোলপাড় করে বেড়াত বিভিন্ন সমুদ্রপথ, কুড়ি হাজারের বেশি লোক কাজ করত তাঁর অধীনে; ব্ল্যাক ডেথের সময় (১৩৪৮ খ্রী) দাতিনির সম্বল ছিল ছোটো একটা বাড়ি আর ৪৭ ফ্লোরিন মাত্র, পরিবর্তিত সময়ে সহযোগিতায় তিনিই হয়ে উঠলেন ইতালির বিখ্যাত ধনশালী বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব। ব্রুকার তাঁর *The Pattern of Social Change* নামক লেখায় এঁদেরই 'Gente Nuova' এবং মার্টিন ভন তাঁর *Sociology of the Renaissance* নামক গ্রন্থে এঁদের 'Haute Bourgeois' বলে চিহ্নিত করেছেন। প্যাস্টন (M. M. Paston) আর মার্টিন ভন তাঁদের গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—ইতালিতেই প্রথম সূচিত হয়েছিল 'money economy'র যুগ। তার ফলে 'The tempo of life was increased'; স্থির, স্থাণু, পূর্বনির্ধারিত সামাজিক জীবনের ভিত্তি খসে গিয়ে শুরু হয়েছিল বিত্ত- বিদ্যা- ও সংস্কৃতি-গত যোগ্যতার অবাধ কর্ষণের যুগ। ফলে আমরা পেয়েছিলাম লরেনজো (Lorenzo) বা লোডোভিকোর (Lodovico) মতো অসাধারণ সব রাজন্যদের, যাঁরা মধ্যযুগীয় রাজন্যদের থেকে আলাদা; জুলিয়াস (Julius) বা লিওর (Leo-X) মতো পোপদের যাঁরা পূর্বতন পোপদের থেকে স্বতন্ত্র; পেয়েছিলাম অসাধারণ সব হিউম্যানিস্টদের যাঁরা শুধু 'স্কলার' নন, 'ইনটেলেকচুয়াল'; এ সময় হস্ত-শিল্পীদের সীমানা ডিঙিয়ে উঠে এসেছিলেন লিওনার্দো (Leonardo da Vinci), রাফায়েল (Raphael), অ্যাঞ্জোলোর (Michelangelo) মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর দল। মানি-ইকনোমির যুগে ব্যক্তিপ্রতিভার এই বিস্ফোরণের যুগটিকে এঙ্গেলস এই ভাষায় অভিনন্দন জানান—'আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি হল সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব। এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, সার্বজনীনতা ও বিদ্যায় অসাধারণ' ইত্যাদি। স্পিংজ (L. W. Spitz) অত্যন্ত সরল স্পষ্ট ভাষায় রেনেসাঁস আর তার অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে যা লিখেছেন তা তুলে দিচ্ছি—'The rise of capitalism and the development of an urban society were necessary precondition for much of the rebirths of culture during the fourteenth and fifteenth centuries. The economic factor was important for the emergence of the modern world. It helped to shape the political and social frame within which Renaissance culture developments took place'. মনে রাখতে হবে, এঙ্গেলস 'প্রকৃত' ধনতন্ত্রের কথা বলেন নি, বলেছিলেন 'প্রথম' ধনতন্ত্রের কথা। এঙ্গেলসের ওই সূত্রাত্মক উক্তিটির রন্ধ্রে ধরা থাকছে ইতালীয় রেনেসাঁসের বিশ্ববিমোহী পুষ্পিত বিকাশ।

এবারে আসি দান্তের প্রসঙ্গে। দান্তে তাঁর ফাঁসির দড়িতে এত মোম ঘষে গেছেন, এঙ্গেলসের সাধ্য কী তাঁকে রক্ষা করেন! তবে কিছু সৃজনশীল প্রতিভা তো থাকেনই, যাঁরা শত বিচারকের ফাঁসির রায় অনায়াসে পেরিয়ে যান। আমার ধারণা—এঙ্গেলস আর দান্তে দুজনে সেই রকমই কীর্তিমান মানুষ। দান্তে সম্পর্কে সিরাজ কতকগুলি চিন্তনীয় প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছেন—যা অনেককেই ভাবিত করবে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের।

প্রথমেই বলে নিই—সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে দান্তের বাস্তুচ্যুত হবার ঘটনা ও 'থুথু গেলা সম্ভব ছিল না' বলে তার ঘরে ফেরা হয় নি—এই প্রসঙ্গটিকে যদি তাঁর ক্ষুদ্রত্বের ইঙ্গিতকারক হিসাবে আনা হয়ে থাকে তবে আমরা যেন মনে রাখি বেশির ভাগ প্রতিভাবান-দের জীবনেতিহাসে বাস্তুচ্যুতি বা অভিবাসন প্রায় একটা অনিবার্য শর্তের মতোই—বুদ্ধ মহম্মদ চৈতন্য, অ্যারিস্টটল, মার্কস—সকলের জীবনেই সে ঘটনা

আছে। পেতার্কাকেও ছেড়ে যেতে হয়েছিল তাঁর বাসভূমি। নইলে কেটে নেওয়া হত তাঁর ডান হাত। অন্তত বিচারের রায় ছিল সেই রকমই। ডুরানটের উক্তিটাও একটু স্মরণ করে নিই 'Every town in Italy has fathered genius and banished it.'

আসল প্রশ্ন দান্তের সেকুলারিজম নিয়ে, তাঁর ধর্মান্ধতা নিয়ে। প্রথমে সেকুলারিজমের প্রশ্নটি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক। লোকচলতি একটা ধারণা আছে—রেনেসাঁস যে আধুনিকতার জন্ম দিয়েছিল সেই আধুনিকতার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান সেকুলারিজম। ধারণাটি আদপেই ঠিক নয়। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট আর্টিস্ট কারো মাথাতেই সেকুলারিজমের সাম্প্রতিক তত্ত্বটি ছিল না। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেতার্কা, 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' হিসেবে বিতর্কিত লরেনজো ভাল্লা (L. Valla) বা 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিস' নামে বিশ্ব-বিখ্যাত এরাজমুস (Erusmus) প্রায় সকলেই ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী আর ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণ; এরাজমুসের একটি উক্তি এইরকম: 'All studies, philosophy, rhetoric are followed for this one object, that we may know Christ and honour him. This is the end of all learning and eloquence'. পড়তে-পড়তে মনে হয় গীতাঞ্জলির খ্রীষ্টীয় অনুবাদ পড়ছি।

ধর্মীয় বিষয় যে ইতালীয় রেনেসাঁসে সেই অর্থে কোনো ট্যাবু ছিল না, তা জোত্তো (Giotto) থেকে টিশিয়ান (Titian) অঙ্কিত রেনেসাঁস চিত্রকলার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেল অ্যানজেলো শতাধিক প্যানেলে যে বিশ্ব-বিশ্রুত ফ্রেস্কো সাজিয়ে গেছেন, তাতে তো ওল্ড টেস্টামেনটই রূপময় হয়ে উঠেছে। সেকুলারিজমের প্রশ্ন তুলে তাকে রেনেসাঁসের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়ার কথা আশা করি কোনো মূর্খেও তুলবে না। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তিগুলির মধ্যে সেনট পিটার গির্জা কি পড়ে না? আসলে, আধুনিকতা ব্যাপারটা ঠিক অঙ্কের মতো সিধে ব্যাপার নয়। জর্জিনোর (Giorgione) আঁকা "স্লিপিং ভেনাসে" যে পরিমাণ আধুনিকতা আছে অ্যানজেলোর আদমের জন্ম বা "গড অ্যানড ম্যান" ফ্রেস্কোয় তার অনুপাত বেশি তো কম নয়। প্রসঙ্গ ধর্ম-বা পুরাণ-সম্পৃক্ত হলেই আধুনিকতার বিচারে তা সব সময় বরবাদ হয়ে যায় না—রেনেসাঁসের শিল্পচর্চায় তার প্রমাণ আছে। তা হলে দান্তে তাঁর "ডিভাইন কমেডিয়া"তে নরক থেকে পরিশুদ্ধি পাহাড় পেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে স্বর্গের দিকে গিয়েছিলেন বলেই ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতার ছুতা তুলে তাঁকে অস্পৃশ্য রাখতে হবে—এমন নয়।

গোড়াতেই বলে রাখি, ঠিক যেমনটি লিখলে বা স্বর্গে ও নরকে যাকে যেখানে রাখলে আমাদের সম্প্রদায়সচেতন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দো-আঁশলা প্রগতিপ্রীতি তৃপ্ত হত, দান্তে ঠিক সেরকম করে ডিভাইন কমেডি লেখেন নি। তিনি লিখেছিলেন নিজের বিশ্বাস আর সাধ্য অনুযায়ী। আর সময়ের বাধ্যবাধকতা কেই-বা অতিক্রম করতে পারে! তাঁর কাব্যের পরিকাঠামো একান্তভাবে মধ্যযুগীয় এবং খ্রীষ্টীয় নীতিতত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত। সেখানে আছে নরক (ইনফার্নো), পরিশুদ্ধি পর্বত (পার্গেটারিও) ও স্বর্গের (প্যারাডিসো) ত্রিস্তরিত ক্রমিকতায় কবির অভিযাত্রা। কোনো সন্দেহ নেই মধ্যযুগীয় পৃথিবীর দিকেই কাত হয়ে আছে এই অভিযাত্রা। তথাপি যাঁরা মনে করেন কাব্যটিতে এমন কিছু আয়োজন আছে, যা দিয়ে তাঁকে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও আধুনিকতার অতৃপ্ত আত্মার এক আশ্চর্য জলবিভাজিকা রূপে চিহ্নিত করা চলে, আমি তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। কেন? সেই প্রশ্নের মীমাংসা আমরা করতে থাকব সিরাজের আনীত দুটি অভিযোগের উত্তর দিতে-দিতে। সিরাজ বলেছেন—'কবি কী প্রচণ্ড

ধর্মান্ধ এবং সাম্প্রদায়িক'। এবং 'রেনেসাঁসের সঙ্গে তাঁর সুদূরতম সম্পর্কও' আবিষ্কার করা অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন, ধার্মিককে কি ধর্মান্ধ বলব? ধর্মান্ধ ব্যক্তি কি কখন বিয়াত্রিসেকে নিয়ে আত্মোন্মোচনের অসহ্য আনন্দে শিহরিত "ভিতা নুভা" লিখতে পারে? ধর্মান্ধ বা সাম্প্রদায়িক অবশ্যই তাকে বলা যায়, যে নিজের ধর্মের ভালোমন্দ বিচারে অক্ষম; যে অন্য ধর্মের প্রতি পোষণ করে অকারণ অন্ধ বিদ্বেষ। "ডিভাইন কমেডিয়া" যিনি পড়েছেন তিনি অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হবেন খ্রীষ্টীয় জগতের অধঃপতন এবং চার্চের দুর্নীতি নিয়ে গ্রন্থটির পর্বে-পর্বে কী ধরনের তিক্ত সমালোচনা আছে। 'হায় অহঙ্কারী খ্রীষ্টানগণ, একদিন তোমরা দর্পভরে জগৎ আর জীবনের সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করতে কিন্তু আজ আত্মোপলব্ধির সাহায্যে বুঝতে পারছ তোমরা নিজেরাই কত তুচ্ছ'। (পরিশুদ্ধিপর্বত, দশম সর্গ) 'হে কনস্তানতাইন। কী ভুলই না তুমি করেছিলে! খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে কোনো ভুল তুমি কর নি। তুমি ভুল করেছ পোপকে রাজক্ষমতা দান করে।' (নরক, উনবিংশতি সর্গ) রেনেসাঁসের 'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' হিসাবে বিখ্যাত লরেনজো ভাল্লা (Valla) "declaimation concerning the false Donation of Constantine" নামক রচনায় পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তি সরিয়ে দিয়ে যে বৈপ্লবিক কাণ্ডটি করেছিলেন তার বীজ বোধ হয় দান্তের এই উক্তিতে রয়েছে। পরিশুদ্ধি পর্বতের ষোড়শ সর্গে বলা হচ্ছে 'আজ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-জগতের পীঠস্থান রোম ধর্মের নামে রাজনীতি শুরু করেছে। ধর্মজগতের গুরু তাঁর ধর্মীয় প্রভাবের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইছেন।'

ভিন্ন একটি ধর্মের জনক মহম্মদকে "ডিভাইন কমেডিয়া"তে নরকের অষ্টবিংশ পর্বে নবম পরিখার ধারে বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়ি রেখে আত্ম-বিদারণকারী অনুতাপে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। কারণ কী? পরিশুদ্ধি পর্বতে দ্বাবিংশতি সর্গে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণটাও ব্যক্ত হয়েছে—খ্রীষ্টজগতের মতে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের একটি অংশকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যান। সেজন্যে খ্রীষ্টীয় ভূস্বর্গের জমি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ফেটে যায়। এজন্যে দান্তের ধর্মনিরপেক্ষতা, আজকের বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বটে, তবে অকারণ অন্যধর্মবিদ্বেষ একে বলা যায় কিনা জানি না। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো, কমেডিয়ার চত্বরে দুর্নীতিগ্রস্ত পোপ, যাজক আর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দের শাস্তির ব্যবস্থাও কিছু কম নেই। যেমন নরকের উনবিংশতি সর্গে দেখা যাবে, পোপ তৃতীয় নিকোলাসের মাথা ঢোকানো আছে নীচে গুহার মধ্যে আর পা বাইরে রাখা, যা আগুনে জ্বাল দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। ধর্মান্ধ কবির স্বর্গে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার না থাকারই কথা অথচ সেখানে ট্রাজান বা রাইপীউস নামে দুজন পেগান বা নাস্তিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। এরা স্বর্গে প্রবেশ করেছে শুধু ন্যায়নিষ্ঠার জোরে।

এবারে আসা যাক পরবর্তী প্রসঙ্গে। "ডিভাইন কমেডিয়া"তে প্রমাণ আছে কবি ধর্ম ছাড়াও আরো নানা ব্যাপার গভীরভাবে জানতেন এবং বুঝতেন। ধর্মগুরুর পরিবর্তে যিনি স্বর্গ-নরক পরিক্রমায় গাইড হিসাবে একজন কবি ও প্রেমিককে বেছে নেন, তিনি যে মূলত কবি ও প্রেমিক তাতে সন্দেহ কী। খ্রীষ্টীয় নীতি আর ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে এর পথপরিক্রমা পরিকল্পিত হলেও, কবি যে জিজ্ঞাসু মনটি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে আছে সংশয়দীর্ণ আধুনিকতার চারিত্র। এক-একটি প্রশ্নের চাবিকাঠি দিয়ে এখানে খুলে দেওয়া হয়েছে এক-একটি সাক্ষাৎকার। প্রশ্ন-গুলি কী রকম? মানুষের মন ও তার ইচ্ছা গ্রহ-নক্ষত্র বা ঈশ্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, না তা স্বাধীন? নাস্তিকেরা কি প্রবেশ করতে পারে স্বর্গলোকে? ইত্যাদি। পথিমধ্যে নানা সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতার ইতিহাস- ও পুরাণ-চেতনার যে বেধ এবং ভূগোল ও

জ্যোতির্বিদ্যার যে ব্যাপ্তি রচনা করা হয়েছে, তা সচরাচর মেলে না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান যুগের পুরাণ আর শিল্পসাহিত্যের জগৎ থেকে অজস্র চরিত্র ও কাহিনী এখানে মুহুর্মুহু উঠে আসে। অতীত ও সমকালের কতরকম ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার ইয়ত্তা নেই। মানবচরিত্রের স্খলন-পতনের এক বর্ণময় আয়োজন এখানে পথে-পথে ছড়ানো। স্বাজাত্যবোধ, শিল্পকলা, মানবেতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে মনোজ্ঞ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত ছোটো-ছোটো আলোচনাগুলি জমে ওঠে।

পেতার্কা বা বোক্কাচিও (Boccaccio) যে চাবি-কাঠি দিয়ে রেনেসাঁস-হিউম্যানিজমের দরজা খুলে-ছিলেন, তার নাম 'Revival of Classical Learning'। হারিয়ে-যাওয়া কত চরিত্র, প্রকীর্ণ কত কথিকা, গ্রীক আর রোমান পুরাণের ছড়ানো-ছিটোনো কত যে গল্প বিনষ্টির অন্ধকার থেকে দান্তে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এনে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর কমেডিয়ার পাঠাগারে—তার ইয়ত্তা নেই। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা তো হারিয়ে-যাওয়া বিদ্যা ও পুঁথির পুনরুদ্ধারের কাজেই বিনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের শ্রম, সময়, বুদ্ধি। গুয়ারিনো (Guarino) বা পিজিকোলির (Pizzicolli) মতো দান্তেও বলতে পারতেন: 'I go to awake the dead'। রেনেসাঁসের কবিশিল্পীরা তাঁদের লেখনী আর রঙ তুলি দিয়ে যেসব পৌরাণিক প্রসঙ্গ রূপময় করে তুলবেন, সেরকম বহু রোমান গ্রীক গল্পচূর্ণ উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে দান্তের কমেডিয়াতে। হংসের রূপ ধরে জুপিটারের লেডার কাছে প্রেমনিবেদন (স্বর্গ, সপ্তবিংশতি সর্গ), ভেনাস-কুপিডের প্রসঙ্গ, জুপিটার ইউরোপার গল্প, পেলেউসকন্যা ডফনের লরেল গাছে পরিণত হওয়ার কাহিনী, পার্নেফাস পর্বতে অ্যাপেলো ও মিউজের কথিকা ইত্যাদি। দান্তে "ভিতা নুভা"তে বিয়াত্রিচেকে আলোর দেবতা রূপে বন্দনা করে সৌন্দর্যমুগ্ধতার সঙ্গে পবিত্রতার যে গ্রন্থিবন্ধন করে দিয়েছিলেন তা শুধু লরাকে নিয়ে পেতার্কার সনেট বা বোক্কাচিওর 'Fiammetta' (যাকে feminine counterpart to the Vita Nuova' বলা হয়েছে) শীর্ষক প্রণয়-গীতিতেই নয়, রেনেসাঁস চিত্রকলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একটি অদৃশ্য নিয়ামক সূত্র হিসাবে কাজ করে গেছে। শুধু মেরি বা ম্যাডোনা নয়, ভেনাসকে নিয়ে আঁকা বহু ছবি দেখেও একথা মনে হয়। জর্জিনোর "স্লিপিং ভেনাস" তার সমূহ নগ্নতা নিয়ে যে নিরপরাধ পবিত্রতায় পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে শায়িত হয়ে আছে, তা যাঁর দেখা আছে তিনি আমার বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন।

দান্তের নরক নিয়ে কেউ-কেউ খুব বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ। স্বর্গ-নরকের প্রতি মধ্যযুগীয় মোহ আর ঘৃণা বর্জন করে আমরা যদি নরক থেকে শান্তি, পরিশুদ্ধি পর্বত থেকে অনুতাপ ও স্বর্গ থেকে পুরস্কারের খ্রীষ্টীয় ঢাকনাটা খুলে দিই, তাহলে ডিভাইন কমেডিয়ার একটা আধুনিক ও নির্মোহ পাঠ বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। আমাদের জগৎ তো শুধু সৌন্দর্য ও পবিত্রতা দিয়ে ঘেরা নয়; সেখানে রাজত্ব করছে কত কুৎসিত কুটিলতা, লোভ, বিদ্বেষ, অহমিকা, হিংস্রতা—দান্তে তাদেরই গুচ্ছে-গুচ্ছে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্যের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে। অনেক অস্বস্তিকর বীভৎসতা আর ভীতিপ্রদ দৃশ্যের চাপ আমাদের সহ্য করতে হয়। এখানে মনে রাখা ভালো—রেনেসাঁসের চিত্রজগতে স্বল্প হলেও এই ধরনের 'terribellita' আর 'fiercest emotion'-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দান্তে, সিগনোরেলি (Signorelli), পোলায়ুয়োলো (Pollaiuolo), তিনতরেত্তোর (Tintoretto) বহু ছবিতে দান্তের ইনফার্নোর চাপা যন্ত্রণা, নিঃশব্দ আর্তনাদ, ভয়ঙ্কর হিংস্রতার রূপায়ণ দেখা যায়। Pollaiuolo-র 'Hercules and Antacus' নামক এনগ্রেভিং-এর কাজটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন রেনেসাঁসের 'all is beauty and joy' নয়—ইনফার্নোর ছায়া সেখানেও প্রলম্বিত ছিল। রেনেসাঁসের মূল কথা যদি 'discoveries of the world and man' হয়, ডিভাইন কমেডিয়াকে তার থেকে খুব বাইরে সরিয়ে রাখা যায় না। মানবচরিত্রের যে অভিযাত্রা ও উত্তরণ এখানে আছে, তাতে গ্যেটের "ফাউস্ট" নাটকের একটি আদিম স্কেচ কমেডিয়াতে দুর্লক্ষ্য নয়। এতে যে নিপুণতায় 'description of human nature in every shape and attitude' সাজানো আছে তাতে মানবচরিত্রের অক্ষয় রূপকার শেক্সপীয়রও একে খনি বিবেচনা করতে পারতেন। তবে কিনা প্রবৃত্তি অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে এখানে আলাদা-আলাদা করে রাখা হয়েছে। এক ধরনের চরিত্রের সঙ্গে আরেক ধরনের চরিত্রকে মুখো-মুখি করে দিলেই নাটক। একই চরিত্রের এরিনায় পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির লড়াই বাধাতে পারলে তো রক্ষা নেই। কমেডিয়া থেকে একেবারে শেক্সপীয়রীয়-ট্রাজেডি। দান্তে অবশ্য অতটা পারেন নি। তিনি যা করেছিলেন তা হচ্ছে এই: প্রাচীন ও মধ্য যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা মহার্ঘ মূল্যবোধ ও মানবিক অভিজ্ঞতার সম্পদগুলিকে তুলে এনে ঝেড়েমুছে তাঁর মহাকাব্যের বিভিন্ন তাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন; বিষয়- আর প্রসঙ্গ- বৈগুণ্যে তাই কমেডিয়ার এক অংশ ভয়ানক, বীভৎস, জটিল; অন্য অংশ শান্ত, সুন্দর, পবিত্র।

আমার মতে নরকবাসের প্রতি আপত্তিটাই মধ্যযুগীয়। যেখানে প্লেটো থেকে এপিকিউর; হোমার থেকে ভার্জিল; ইউরিপিডিস থেকে সেনেকা; ইউক্লিড থেকে টলেমি; হিপোক্রিট থেকে অফিয়ুস; কাসেল্লা থেকে গিদো; ইবন রুশদ থেকে মহম্মদ সকলেই আছেন, সেখানে পত্রলেখকের প্রস্তাবমতো মার্কস, এঙ্গেলসকে ঢোকালে তো নরক গুলজার। আমার ধারণা, বিয়াত্রিসে স্বর্গে না থাকলে দান্তে ভুলেও ও পথ মাড়াতেন না। রাফায়েলের "স্কুল অব এথেন্স" ছবিটি দেখে কে যেন বলেছিলেন 'Such a parliament of wisdom had never been painted'। এদের নিয়ে একটু আলাদা করে এঁকে নিতে পারলে দান্তের নরক তার থেকে খুব খারাপ কিছু হত না।

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৩এ সরকার হাট লেন, কলকাতা-৬১

২

ভাষাচিন্তায় ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ

"চতুরঙ্গ"-র সেপটেমবর ১৯৯১ সংখ্যায় "মানিকচাঁদের গীত"-শীর্ষক যে চিঠিটি (লেখক: দেবাশিস নাথ) প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে এটি একেবারেই স্পষ্ট যে, কপটনিদ্রা, মিথ্যাভাষণ বা বিকল্প সাহিত্য বাজারে চালু করে, প্রকৃত বাস্তব-অস্তিত্বসম্পন্ন গ্রিয়ারসনের *The Song of Manikchandra* (Published in Journal of Asiatic Society of Bengal, Part I, No. 3, 1878)-কে আড়াল করে, পশ্চিম-বঙ্গের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আজ অচিহ্নিত হলেও, বহুকাল ধরেই গোপনে দ্বিজাতিতত্ত্ববাদী মানসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সচেতন পাঠকমাত্রই অবহিত আছেন যে দ্বিজাতিতত্ত্ববিরোধী উপাদানে পূর্ণ নাথসংস্কৃতিসঞ্জাত সাহিত্য-নিদর্শনগুলিকে সুধী-সমাজে তুলে ধরতে দীনেশচন্দ্র ও শহীদুল্লাহ্, ঘোর ব্রাহ্মণ্যবাদকবলিত যুগেও, চেষ্টা করে গেছেন। শহীদুল্লাহ্ বহুদিন আগেই লিখেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাঙ্গালা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাঙ্গালার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক' ("আনন্দবাজার পত্রিকা", ২৩শে মে, ১৩৫৫)। প্রকৃতপক্ষে নাথসংস্কৃতির প্রাচীনতার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলায় তথা ভারতে মুসলমান জনগণের বসবাসের প্রাচীনতাও নির্ণীত হতে পারে। নাথপন্থে মুসলমান জনগণের ব্যাপক যোগদানের বহু প্রমাণ

আছে। কিছুদিন আগেও মুসলমান লেখক-লিখিত "গুলীচাঁদের সন্ন্যাস"-শীর্ষক পুঁথিটি চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয় এবং মুহম্মদ জাকারিয়ার অপরিসীম পরিশ্রমজাত সম্পাদনায় সেটি ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়, ভূমিকালেখক প্রখ্যাতনামা আহমদ শরীফ সাহেব। আর শেখ ফয়জুল্লার "গোরক্ষবিজয়"—দীনেশচন্দ্রের মতে যা বাঙলা সাহিত্যের 'আদিযুগের দিক্‌নির্দেশক স্তম্ভ'—তো বহুদিন আগেই আবদুল করিম সাহেবের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা যদি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণগুলি একত্রিত করি, তাহলে চমৎকৃত হব এই দেখে যে নাথসংস্কৃতিজাত গ্রিয়ারসন-সংগৃহীত *The Song Manikchandra* (1878)-কে আড়াল করার নানান পদ্ধতিই বাজারে গোপনে চালু রয়েছে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমরা আদপেই অবহিত নই, সন্দেহ করা বা ধরতে পারা তো দূরের কথা! দেবাশিসবাবুর চিঠিটি এ ব্যাপারে সতর্কতার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্য-উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শক্রমে ১৯৮৫ সালের ১৪ থেকে ১৯ মে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে বাঙলা ভাষাপ্রসঙ্গে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল। সেই আলোচনাগুলি একসঙ্গে পুস্তকাকারে (নাম: "প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা") পশ্চিমঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির প্রথম প্রকাশ হিসেবে প্রকাশিত হয় (মে, ১৯৮৬)।

প্রথম উল্লেখযোগ্য এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে দ্বিজাতিত্ববিরোধী সংস্কৃতি আর সাহিত্যকে যিনি বীরবিক্রমে তুলে ধরেছিলেন, সেই দীনেশচন্দ্রের নাম পর্যন্ত ওই পুস্তকে নেই। দীনেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ততম পরিচিতি, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর ভাষায়, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সত্যকার প্রথম ইতিহাসকার। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দীনেশচন্দ্রের "অমর কীর্তি" রূপে স্বীকৃত। এই গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ ("হিস্টরি অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গেয়েজ অ্যানড লিটারেচার") পৃথিবীর নানা স্থানের বিদ্বজ্জনদের সমাদর লাভ করেছিল। দীনেশচন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাস লেখার কালে আবিষ্কারকের ভূমিকাও নিয়েছিলেন। বাঙলার জনসংস্কৃতির বিষয়ে বিপুলপরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করে বাঙলা আর ইংরাজিতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। সেসব রচনায় ইতিহাসবোধ আর সাহিত্য-রসের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক (দ্রষ্টব্য: "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ", সপ্তম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৬০৭)। ঘোর ব্রাহ্মণ্যবাদ-কবলিত পরিবেশে মাত্র একজনকেই পরবর্তী কালে সহমর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র, তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

উক্ত আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার গ্রিয়ারসনের ১৮৭৮ সালের সংগ্রহটিকে (যা রংপুরের লোকভাষা বা উপভাষা) ঢেকে দেবার উদ্যোগ। যথা 'উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই পাশ্চাত্য ভাষাগবেষকদের দৃষ্টি পড়েছিল উপভাষার উপর।...১৯২৩ সনে *F. E. Pargiter* এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে তাঁর "*Vocabulary of Peculiar Bengali Words* বের করেন—এটিই এদেশে উপভাষা অভিধানের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। ...গ্রিয়ারসনের সম্পাদনায় ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ২৬ বছর ধরে *The linguistic Survey of India*" গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।' (প্রসঙ্গ বাংলাভাষা, পৃষ্ঠা ১৪৭)। "মানিকচাঁদের গান" বলে যে কোনোকালে বাঙলা লোকভাষা-সংগ্রহ ছিল, তার সাথে যে জড়িত ছিলেন গ্রিয়ারসন সমেত আরো দুই দিক্‌পাল দীনেশচন্দ্র এবং শহীদুল্লাহ, তা ওই বই পড়ে (অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির সামগ্রিক দৃষ্টিকোণটি

সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে) কিছুমাত্র বুঝবার উপায় নেই।

তবে তারও আগে ড. সুকুমার সেনের একটি মন্তব্যে, অনুরূপভাবেই ধূম্রজালে হারিয়ে গেছে গ্রিয়ারসনের মানিকচাঁদ। 'আমাদের লোকসাহিত্যে গাথাকবিতা চিরদিনই ছিল, সভা-সাহিত্যে তাহার স্থান বর্তমান শতাব্দীর পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই এবং রবীন্দ্রনাথের আগে কেহই লোকসাহিত্য তথা গাথা-কবিতাকে কোনই মূল্য দেন নাই। দীনেশবাবুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "ময়মনসিংহ গীতিকা" বাহির হইবার পরই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গাথা-কবিতার মর্যাদা স্বীকৃত হইতে থাকে।' (বাংলা গাথা কাব্য, ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৬২, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত অবস্থানটি যে কোথায়, তা দেবাশিসবাবুর চিঠিতে ("চতুরঙ্গ", সেপ্টেম্বর, ১৯৯১) দারুণভাবেই স্পষ্ট। শান্তিনিকেতন-এর অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচিত অভিধান "বঙ্গীয় শব্দকোষ" রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস পরিচয়সমেত প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালে প্রচলিত প্রধান-প্রধান বাঙলা গ্রন্থগুলি ওই অভিধানে ঠাঁই পেলেও, নির্মম হস্তে বিদায় দেওয়া হয়েছে গ্রিয়ারসনের "মানিকচন্দ্র রাজার গান"কে। যে সংস্কৃতি থেকেই কাহিনীর উৎপত্তি হোক, গ্রিয়ারসনের সংগ্রহটিকে বাঙলা ভাষার নিদর্শন, বিশেষত মৌখিক বাঙলা ভাষার, তা কি হরিচরণ জানতেন না? আসল ব্যাপার অবশ্য অভিধানের ভূমিকা-লেখক "ভাষাচার্য" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যেই আভাসিত,...'আমরা আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ্যের আদর্শকে এবং দেবভাষা সংস্কৃত ও মাতৃভাষা বাঙ্গলাকে আমাদের প্রণাম নিবেদন করিতেছি।' সবার ওপরে হচ্ছে "ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ"।

দ্বিজাতিতত্ত্ববাদকে কেন্দ্র করে যাদের ভাষাচিন্তা আবর্তিত, ভাষার উৎস নির্ণয়ে যে প্রধানত মৌখিক ভাষাকেই গুরুত্ব দিতে হয়, তা আধুনিক কালের ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেছেন। যেমন 'The problem of linguistics concerns mainly the spoken language though written language forms are also considered'. (Invitation to Linguistics, Pei Merio, George Allen and Unwin, London, 1965)। কথায় ও কাজে, এ ব্যাপারে ওপার বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ, মহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্য, 'ভাষার বিবর্তনে প্রথমে মুখে-মুখে শুরু হয়, পরে গানে-গানে, গাথায়-গাথায় ও লেখায় পড়ায় এবং পরিশেষে সাহিত্যে স্থান পাইয়া আভিজাত্য লাভ করে।' (বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স্বরবর্ণ অংশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৮৭৮ সালে বাঙলা মৌখিক ভাষা-সংগ্রহ করে গ্রিয়ারসন যে সুবর্ণসুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন, দীনেশচন্দ্র তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভাষাচিন্তার পরিচয় রেখেছিলেন ("বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দ্রষ্টব্য। প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬)। অথচ, বহু পরবর্তী সুনীতি-কুমার মানিকচাঁদকে অগ্রাহ্য করেছেন।

গার্গী দেবনাথ
আগরতলা, ত্রিপুরা

৩

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

আগ্রহ নিয়ে পড়ছি সুধীর চক্রবর্তীর "ব্রাত্য, মন্ত্র-বর্জিত লালন ফকির।" নানা তথ্যে, গভীরতা-সঞ্চারী নানা তত্ত্বে যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছি, তেমনই ভেঙে যাচ্ছে লালন ফকির সম্পর্কে এযাবৎকাল পর্যন্ত জানা নানা বিশ্বাস।

সরলাদেবী-রবীন্দ্রনাথের হাতে যে লালনচর্চার সূত্রপাত, শতাব্দী পেরিয়ে আজও তা অব্যাহত।

অতীত থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত লালনচর্চার গতি-প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যায়, এই লালন-জিজ্ঞাসার সবটাই লোকায়ত সংস্কৃতির পরম্পরাগত দায় থেকে আসে নি। বরং বেশির-ভাগ ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ। তাই দেখা যায়, কখনো লালনের গান প্রকাশ করে কেউ নিজেকেই তুলে ধরছেন জনসমক্ষে, কেউ বহু বছর পর লালনের কোনো দুষ্প্রাপ্য স্কেচ আবিষ্কার করে মেতে উঠছেন আত্মম্ভরি খেলায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্যদিকে কিছু সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন মানুষ লালনের পূর্বজীবন হিন্দুর না মুসলমানের—এ নিয়ে ব্যস্ত। মুসলমান হিসেবে লালনকে কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর গানের লাইনের অংশবিশেষ গানের ভাবকে তোয়াক্কা না করেই পালটে দিচ্ছেন, জীবনচরিতে সুপরিকল্পিতভাবে লালনের মুখে বসে যাচ্ছে আরবি, উর্দু শব্দ। হিন্দুসম্প্রদায়জাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, না দেখেই 'তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাই, উজ্জ্বল চক্ষু, গৌরবর্ণ মুখশ্রী এবং প্রশান্তভাব' বর্ণনা করে কেউ তাঁকে আখ্যা দিচ্ছেন হিন্দু। যদিও আমরা জানি যে কোনো ফকির বা সন্ন্যাসী সম্পর্কে সবকিছু অবহিত হবার পথে প্রধান বাধা লেখক-কথিত 'উৎস থেকে উৎসারিত বিভ্রান্তি', তবু আন্তরিকতা, ভালোবাসা, বিশ্লেষণমুখী উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে এলে ব্যাপারটি হয়তো এতখানি মিথের পর্যায়ে চলে যেত না। তৈরি হত না এত বিতর্ক।

"হিতকরী"-র যে সম্পাদকীয় বক্তব্য লালন সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমাদের অবহিত করায় সেখানে 'নাকি' জাতীয় সংশয়বাচক শব্দ এবং 'নিষেধক্রমে ও অজ্ঞতাবশত শিষ্যগণ কিছুই বলিতে পারে না' জাতীয় লাইন দেখে বিবরণের সূত্র-আবিষ্কর্তা এবং বিবরণের সূত্র-আবিষ্কার কোথা থেকে হয়েছে জানা খুবই অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে সনৎকুমার মিত্র তাঁর "লালন ফকির—কবি ও কাব্য" গ্রন্থে লিখছেন—'আবুল আহসান চৌধুরী অনেক পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের (circumstantial evidence) দ্বারা সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা করেছেন যে এটি "হিতকরী"-র একাধারে সম্পাদক ও এজেন্ট এবং কুষ্টিয়ার প্রখ্যাত উকিল রাইচরণ দাসের রচনা।' যদি সনৎকুমার মিত্রের মতো 'যুক্তি-আশ্রয়ী এই বিচারকে গ্রহণযোগ্য' বলে ধরা যায়, তাহলে বিবরণের সূত্র 'আশপাশের লোকমুখে', 'বাচনিক কিম্বদন্তীতে' 'অন্য কোনোভাবে অনুরাগীদের রটনায়' এবং অবশ্যই রাইচরণ দাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে তৈরি—এ কথা বলা যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখা বিবরণে 'নাকি' জাতীয় সংশয়বাচক শব্দ সম্ভব কিনা, প্রশ্ন উঠতে পারে। এ কথারও সহজ উত্তর - লেখক-কথিত 'উৎস থেকে উৎসারিত বিভ্রান্তি'। আর পরবর্তী কালে "হিতকরী"র সম্পাদকীয় বক্তব্যের এই সংশয়বাচক শব্দের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন কিছু মানুষ। ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত নানা স্বার্থ মিলেমিশে বিষয়টিকে যেমন করে তুলেছে বিতর্কিত, তেমনই লালনকে দিয়েছে এক মিথের আড়াল। এই রহস্যঘন বিতর্কিত ধোঁয়াশা থেকে লালন বের হয়ে আসুন, তাঁকে ভালোভাবে জানা হোক—সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে এটাই কাম্য। আশা রাখি, লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ সুধীর চক্রবর্তী সে কাজটি ভালোভাবেই সম্পন্ন করবেন।

সুদীপ জোয়ারদার
পাগলাচণ্ডী, নদীয়া